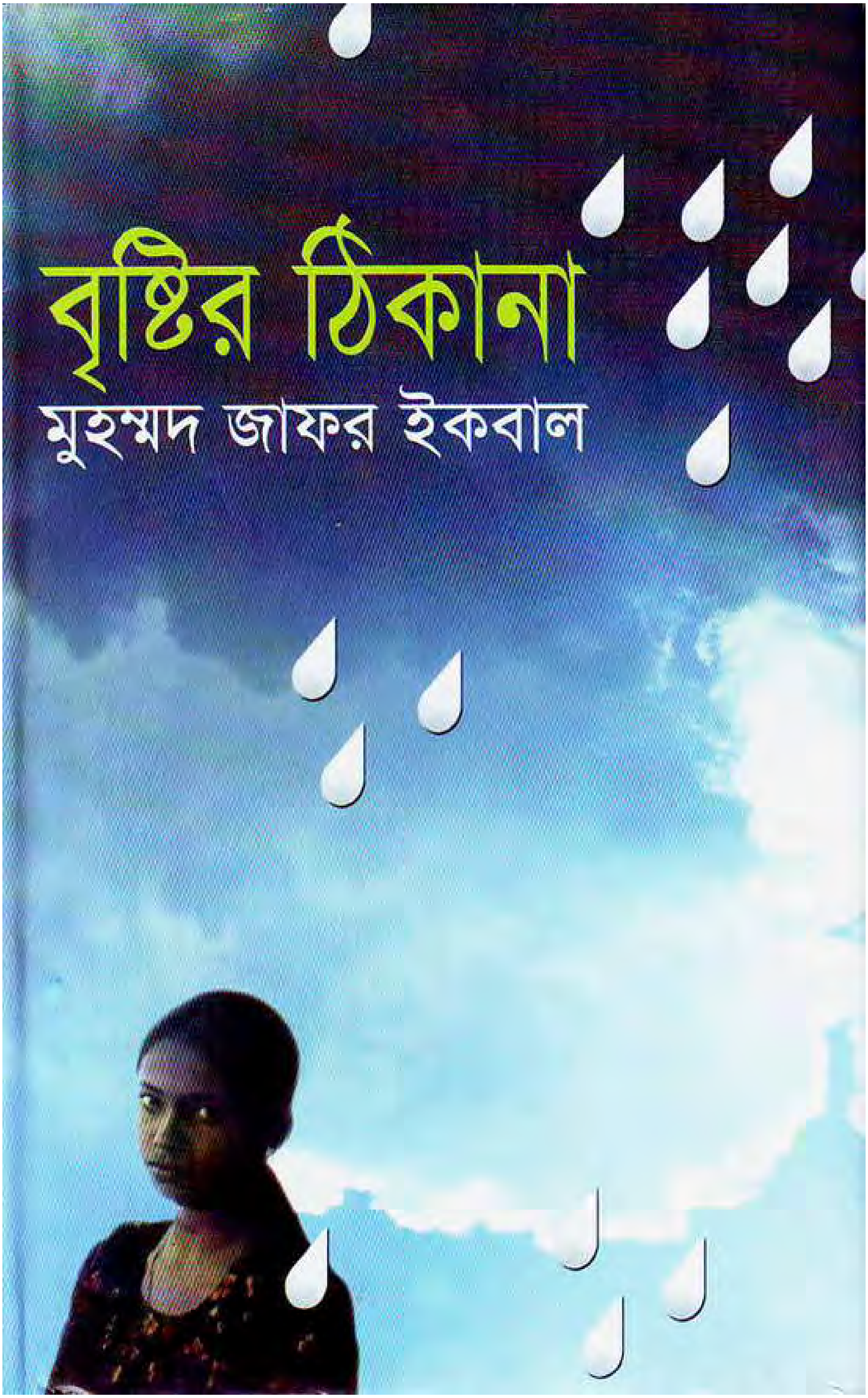
বৃষ্টির ঠিকানা
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মিসেস হেনরিকসন

জ্যামিতি ক্লাশটাকে টুম্পার সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে। ক্লাশটা পড়ান মি. কিনবারো, তবে ক্লাশের সবাই তাকে ডাকে মি. ক্যাঙ্গারু। সত্যি সত্যি মি. কিনবারোর মাঝে একটা ক্যাঙ্গারু ক্যাঙ্গারু ভাব আছে—মানুষটা কেমন জানি লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটেন। ক্লাশের ভেতর কথা বলতে বলতে তাদের কান একেবারে ঝালাপালা করে দেন কিন্তু কী নিয়ে কথা বলেন তারা কেউ কিছু বোঝেনা। মি. ক্যাঙ্গারুর গুরু হচ্ছেন ইউক্লিড, ক্লাশে কথায় কথায় ইউক্লিডের উদাহরণ দেন আর প্রত্যেকবার ইউক্লিডের নাম উচ্চারণ করার সময় তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়, গলা কাঁপতে থাকে আর তাঁকে দেখে মনে হয় এক্ষুণি বুঝি হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে শুয়ে একটা সালাম করে দেবেন। টুম্পার যা হাসি পায় সেটা আর বলার মতো নয় কিন্তু এত কিছুর পরেও মি. ক্যাঙ্গারুর ক্লাশের মাঝে কোনো রস কস নেই। এক ঘন্টার ক্লাশটাকে মনে হয় এক বছর লম্বা, সারাক্ষণ টুম্পার চোখ ঘুরে ঘুরে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে চলে যায় সে অপেক্ষা করতে থাকে কখন মিনিটের কাঁটা ন'য়ের মাঝে পৌছাবে আর পি.এ. সিস্টেম থেকে ক্লাশ শেষ হওয়ায় মধুর একটা বেলের শব্দ ভেসে আসবে।

মি. ক্যাঙ্গারু খুব সময় মেনে চলার চেষ্টা করেন। ক্লাশের সবাই দেখেছে মানুষটা ক্লাশ শুরু হবার দুই এক মিনিট আগে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। মিনিট আর সেকেন্ডের কাঁটাটা ঠিক যখন বারোটার ওপর হাজির হয় তখন মি. ক্যাঙ্গারু দড়াম করে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে নাটকীয়ভাবে বলেন, "গুড মর্নিং মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস!" এমন হাস্যকর ব্যাপার যে সেটা বলার মতো নয়।

আজকে অবশ্য অন্য ব্যাপার, সময় অনেকক্ষণ আগে পার হয়ে গেছে এখনো মি. ক্যাঙ্গারুর দেখা নেই, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। যে মানুষ কখনো এক সেকেন্ড দেরী করে না তাঁর জন্যে পাকা দশ মিনিট দেরি করা সোজা কথা নয়—প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। ক্লাশের ছেলেমেয়েরা একটু অস্থির হয়ে উঠছে, কেভিন কাগজ দিয়ে প্লেন তৈরী করে এদিক-সেদিক ছুঁড়ে মারতে শুরু করেছে। জেসিকা চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে কোমর দুলিয়ে গান গাওয়ার ভঙ্গী করছে তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে মাইকেল আর জিম অদৃশ্য একটা গিটার বাজাচ্ছে। পিটার একটা রাবার ব্যান্ডের মাঝে কাগজের ছোট ছোট গুটলি লাগিয়ে আশেপাশের ছেলেমেয়েদের নাক নিশানা করে টার্গেট প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করছে।

এইভাবে যখন আরও পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে তখন মোটামুটি সবাই বুঝে গেল আজ কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, ক্লাশে মি. ক্যাঙ্গারু বা অন্য কেউই আসবে না। তারা হৈ হৈ করে যখন বইপত্র তুলে ক্লাশ থেকে বের হয়ে যাবার জন্যে দাঁড়ালো ঠিক তখন দরজা খুলে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলার মাথা ক্লাশের মাঝে উঁকি দেয়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, চোখে সোনালি রঙের একটা চশমা। কেউ যে পকেটের পয়সা খরচ করে এরকম পুরানো মডেলের একটা চশমা কিনতে পারে টুম্পা নিজের চোখে না দেখলে সেটা বিশ্বাস করতো না। চশমাটা নিশ্চয়ই এই মহিলার খুব প্রিয় চশমা কারণ সেটা কটকটে হলুদ রঙের একটা স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা যেন নাকের ডগা থেকে লাফ দিয়ে সেটা বের হয়ে চলে যেতে না পারে! মহিলাটি ক্লাশের ভেতরে এক নজর দেখে খানিকটা অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে ভেতরে ঢুকলেন। তাকে দেখে সবাই বুঝে গেল আজকে মি. ক্যাঙ্গারু আসছেন না তার বদলে এই মহিলা হবেন তাদের সাবস্টিটিউট টিচার। সাবস্টিটিউট টিচার মানেই হচ্ছে সময় নষ্ট তাই সবাই নাকের ভেতর দিয়ে ফোঁস করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে নিজেদের চেয়ার টেবিলে বসতে শুরু করলো।

মধ্যবয়স্কা মহিলাটি ক্লাশের ভেতরে ঢুকে টেবিলের উপর তার হাতের কাগজগুলো রেখে সবাইকে নিজের চেয়ার টেবিলে বসে যাবার সময় দিলেন তারপর সবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলেন। মানুষ নার্ভাস হলে সবসময় একটু হাসার চেষ্টা করে কিন্তু এই মহিলাকে একটুও নার্ভাস মনে হলো না।

মহিলাটি চশমার ওপর দিয়ে ক্লাশের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ক্রিস্টিনা হেনরিকসন। তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো আমি তোমাদের সাবস্টিটিউট টিচার।"

ক্লাশের ছেলেমেয়েরা কেউ জোরে কেউ আস্তে মাথা নাড়ল, কেউ গলা দিয়ে কেউ নাক দিয়ে একরকম শব্দ বের করল। তবে সবার চোখে মুখেই এক ধরনের হাল ছেড়ে দেবার মতো ভাবভঙ্গী। মি. ক্যাঙ্গারু তাদের নিয়মিত টিচার তাঁর ক্লাশেই সবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আর সোনালি রঙের চশমা পরা এই সাবস্টিটিউট টিচারের ক্লাশে কী হবে সেটা আন্দাজ করা মোটেই কঠিন নয়। মিসেস হেনরিকসন পুরো ক্লাশের দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, "মজাটা কী হয়েছে শোনো—"

মজার কথা শুনে ক্লাশের সবাই অবশ্যি নড়েচড়ে বসে মিসেস হেনরিকসনের দিকে তাকালো। মিসেস হেনরিকসন বললেন, "আজকে তোমাদের দরকার একজন জ্যামিতির টিচার কিন্তু আমি হচ্ছি ভূগোলের টিচার।"

এর ভেতরে মজার বিষয়টা কী কেউ ধরতে পারল না। একজন ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে তোমাকে এনেছে কেন?"

"জিওমেট্রির টিচার আনতে গিয়ে ভুল করে জিওগ্রাফির টিচার নিয়ে চলে এসেছে।" কথাটা শেষ করে মিসেস হেনরিকসন হি হি করে হাসতে শুরু করলেন। কথাটা এমন কিছু হাসির কথা নয় কিন্তু মিসেস হেনরিকসনের এরকম বাচ্চাদের মতো হাসি দেখে সবাই তার সাথে হাসতে শুরু করে দিল।

মিসেস হেনরিকসন শেষ পর্যন্ত হাসি থামালেন, চোখ মুছে বললেন, "এখন বল তো কী করি? আমি তো তোমাদের জ্যামিতি পড়াতে পারব না। যদি চেষ্টা করি তাহলে ইউক্লিড তার কবরে ওলট-পালট খেতে থাকবে—"

জেসিকা বলল, "আমাদের একটা গান গেয়ে শোনাও।"

জেসিকা ফাজিল ধরনের মেয়ে, কথা বলার ঢংটিও ছিল একটু গায়ে জ্বালা ধরানোর মতো কিন্তু মিসেস হেনরিকসন সেটা লক্ষ করলেন বলে মনে হলো না, জেসিকার কথা শেষ হবার সাথে সাথে দুই হাতে চুটকি দিতে দিতে সুরেলা গলায় গেয়ে উঠলেন,

"আই এ্যাম লাইক এ বার্ড

আই অ্যাম গোয়িং টু ফ্লাই এ্যাওয়ে
আই ডোন্ট নো হোয়্যার মাই সোল ইজ সোল ইজ
আই ডোন্ট নো হোয়্যার মাই হোম ইজ..."

মিসেস হেনরিকসনের মতো মধ্যবয়সী একজন মহিলা এতো সুন্দর করে গানটি গেয়ে উঠলেন যে সবাই কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। জেসিকা মুগ্ধ হয়ে বলল, "মিসেস হেনরিকসন! তুমি কী সুন্দর গান গাইতে পার!"

মিসেস হেনরিকসন বললেন, "আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ভেবেছিলাম বড় হয়ে গায়িকা হব। আর দেখো বড় হয়ে আমি হয়েছি ভূগোলের টিচার।" মিসেস হেনরিকসন আবার ছোট বাচ্চাদের মতো হি হি করে হেসে উঠলেন যেন গায়িকা হতে চেয়ে ভূগোলের টিচার হয়ে যাওয়া খুব মজার ব্যাপার।"

কেভিন জিজ্ঞেস করল, "তোমার ভূগোল ভালো লাগে না?"

"লাগবে না কেন? খুব ভালো লাগে। ভূগোল মানে তো শুধু জায়গার কথা না। সেই জায়গার মানুষেরও কথা—"

মিসেস হেনরিকসন ক্লাশের সবার মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "তোমাদের ক্লাশের দিকে তাকিয়ে দেখো, পৃথিবীর কতো দেশের কতো মানুষ!" জিমের গায়ের রং কুচকুচে কালো, তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার পূর্বপুরুষ এসেছিল আফ্রিকা থেকে," জেনীর চোখ ছোট ছোট নাক একটু চাপা, তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার পূর্বপুরুষ এসেছে এশিয়া থেকে। সম্ভবত পূর্ব এশিয়া।" কেভিনের খাড়া নাক, নীল চোখ, সোনালি চুল, তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই এসেছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ থেকে!" মরিয়মের বড় চোখ, কালো চুল, তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই মধ্যপ্রাচ্যের, তাই না?"

মরিয়ম মাথা নাড়লো এবং মিসেস হেনরিকসন এমন ভাব করলেন যেন তিনি যুদ্ধ জয় করে ফেলেছেন। তিনি ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে টুম্পার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, "আর তুমি নিশ্চয়ই এসেছ ইন্ডিয়া থেকে।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "না মিসেস হেনরিকসন। আমি এসেছি বাংলাদেশ থেকে।"

বলতে গিয়ে টুম্পার গলা একটু কেঁপে গেল কারণ এই দেশের বেশিরভাগ

মানুষ বাংলাদেশকে চেনে না। যারা চেনে তারা শুধু বাংলাদেশের খারাপ খারাপ জিনিসগুলোর কথা জানে। দেশটার নামও ভালো করে বলতে পারে না, বলে, ব্যাংলাডেশ। টুম্পা একটু শংকিত চোখে মিসেস হেনরিকসনের দিকে তাকিয়ে রইল, এখন কী এরকম কিছু ঘটবে? কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না বরং মিসেস হেনরিকসনের চোখ কেমন জানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "বাহ্! কী চমৎকার। আমাদের দেশে বাংলাদেশের একজন মেয়ে আছে।"

টুম্পা অবাক হয়ে দেখল মিসেস হেনরিকসন ব্যাংলাডেশ বলেন নাই, একেবারে শুদ্ধ করে বলেছেন বাংলাদেশ। খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন তারপর বললেন, "যতদূর মনে পড়ে সত্তুরের দিকে জর্জ হ্যারিসন, জোন বায়াজ, রবি শংকর সবাই মিলে একটা কনসার্ট করেছিল বাংলাদেশের জন্যে।" মিসেস হেনরিকসন টুম্পার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাই না?"

কিসের কনসার্ট সেটা সম্পর্কে টুম্পা কিছুই জানে না, সে কী বলবে বুঝতে না পেরে অনিশ্চিত ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, যার উত্তর হ্যাঁ, বা না দুটোই হতে পারে। মিসেস হেনরিকসন সেটা খেয়াল করলেন বলে মনে হলো না চোখ বড় বড় করে বললেন, "নিইউয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে সেই কনসার্ট হয়েছিল, আমি তখন টিনএজার। সেই কনসার্টে গিয়ে সবার গান শুনে একেবারে সারা জীবনের জন্যে পাল্টে গিয়েছি। তখন বাংলাদেশে যুদ্ধ হচ্ছে। কমবয়সী গেরিলারা যুদ্ধ করছে, দশ মিলিয়ন মানুষ উদ্বাস্তু—কী কষ্ট মানুষের। এলেন গিনসবার্গ সেটার উপর একটা কবিতা লিখেছেন, জেসোর রোড, অসাধারণ কবিতা!"

টুম্পা কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে মিসেস হেনরিকসনের দিকে তাকিয়ে রইল। এলেন গিনসবার্গটা কে? জেসোর রোড কবিতাটি কী? সে তো এগুলো কিছু জানে না।

মিসেস হেনরিকসন একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "বাংলাদেশের মানুষের সংখ্যা একশ চল্লিশ মিলিয়ন—পৃথিবীর মোট মানুষের শতকরা দুই ভাগ। যার অর্থ পৃথিবীর যে কোনো পঞ্চাশজন মানুষকে নিলে তার মাঝে একজন হবে বাংলাদেশের। এতোগুলো মানুষ থাকে কতোটুকু জায়গার মাঝে তোমরা জান?"

টুম্পা অস্বস্তি অনুভব করে, তার জানা উচিৎ ছিল, কিন্তু সে জানে না। অনেক ছোট থাকতে সে তার আম্মুর সাথে আমেরিকা চলে এসেছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। মিসেস হেনরিকসন সেটা নিয়ে মাথা ঘামালেন না, বললেন, "বাংলাদেশের সাইজ আমাদের উইসকনসিনের মতো!"

ক্লাশের সবাই একটা বিস্ময়ের মতো শব্দ করল। মিসেস হেনরিকসন টুম্পার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাই না?"

টুম্পা আবার অনিশ্চিতের মতো মাথা নাড়ল যার উত্তর হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হতে পারে। মিসেস হেনরিকসন আবার একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "পশ্চিমা প্রেস সবসময় বাংলাদেশের খারাপ পাবলিসিটি করেছে তার কারণ তারা আসলে এই জাতিটার শক্তিটা ধরতে পারে নি।"

জিম জানতে চাইল, "সত্যিকারের শক্তিটা কী?"

"বাংলাদেশ হচ্ছে একটা বদ্বীপ। এমন একটা জায়গা যেখানে প্রায় প্রত্যেক বছর একটা বন্যা না হয় একটা ঘূর্ণিঝড় হয়। তারা যেরকম বন্যা আর ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে টিকে থাকে আমরা সেটা কল্পনাও করতে পারব না। প্রকৃতি কিছুতেই তাদের হারাতে পারে না। এই জাতি অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু, প্রকৃতি তাদের শুইয়ে দেবার চেষ্টা করে, তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। ফ্যান্টাস্টিক। আমাদের একটা মাত্র ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল ক্যাটারিনা তখন আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল মনে আছে?"

সবাই মাথা নাড়ল, তাদের মনে আছে।

মিসেস হেনরিকসনের হঠাৎ করে কিছু একটা মনে পড়ল, চোখ বড় বড় করে বললেন, " তোমরা সবাই নিশ্চয় এই বছরের নোবেল পুরস্কারের কথা শুনেছ। শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশের একজন।"

টুম্পা এবারে মাথা নাড়ল, সে এই তথ্যটা জানে। দেখা গেল আরো কয়েকজনও সেটা জানে। মাইকেল বলল, "প্রফেসর উনুস।"

টুম্পা শুদ্ধ করে দিল, বলল, "না। উচ্চারণ ইউনূস। প্রফেসর ইউনূস।"

মিসেস হেনরিকসন বললেন, "দারিদ্র্য কীভাবে দূর করা যায় তার উপর অসাধারণ কাজ করেছেন প্রফেসর ইউনূস। তোমাদের সবারই সেটা জানা দরকার। আমাদের দেশে এতো সম্পদ তারপরেও এখানে অনেক গরিব মানুষ আছে, এটা ঠিক না। জাতি হিসেবে এটা আমাদের ব্যর্থতা। খুব বড় ব্যর্থতা।"

মিসেস হেনরিকসন এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন এই পুরো ব্যর্থতাটা তার নিজেরই, তিনি নিজেই যেন এই দোষটা করে ফেলেছেন।

বাংলাদেশের এতো প্রশংসা করার পর নিজের দেশের ব্যর্থতার কথা বলা হচ্ছে দেখে কেভিনের মনে হলো একটু রাগ হলো, সে গম্ভীর গলায় বলল, "আমাদের অনেক সাফল্যও আছে মিসেস হেনরিকসন।"

মিসেস হেনরিকসন সুন্দর করে হাসলেন, বললেন, "অবশ্যই আছে। একশোবার আছে। তোমরা যদি ইউরোপ যাও কিংবা এশিয়া যাও দেখবে তারা আমাদের—আমেরিকানদের শুধু সমালোচনা করছে। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জান?"

"কী মিসেস হেনরিকসন?"

'তারা চোখ বন্ধ করে আমাদের অনুকরণ করে। আমরা যেটা করি সেটাই হয়ে যায় পৃথিবীর কালচার। ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক তাতে কিছু আসে যায় না।" মিসেস হেনরিকসন আবার হি হি করে হাসতে থাকলেন, যেন এর থেকে মজার ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

ক্লাশের ছেলেমেয়েরাও হাসবে কী না সেটা বুঝতে পারল না, কয়েকজন একটু চেষ্টা করে থেমে গেল কারণ মিসেস হেনরিকসন হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেছেন। গম্ভীর হয়েই বললেন, "আচ্ছা বল দেখি, আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি কী?"

জিম বলল, "এটম বোমা।"

"উহুঁ।" মিসেস হেনরিকসন মাথা নাড়লেন, "বোমা কখনো কোনো জাতির শক্তি হতে পারে না।"

জেসিকা বলল, "গণতন্ত্র।"

"সেটা একটা শক্তি, কিন্তু পৃথিবীর আরো অনেক দেশে গণতন্ত্র আছে। সত্যি কথা বলতে কী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র হচ্ছে ভারতবর্ষে—এক বিলিয়ন থেকেও বেশি মানুষের গণতন্ত্র।"

জেনি বলল, "কম্পিউটার—"

মিসেস হেনরিকসন মাথা নাড়লেন, বললেন, "উহুঁ। এই সায়েন্স, টেকনোলজি কালচার এগুলোই শক্তি কিন্তু সেটা নির্ভর করে মানুষগুলোর উপর। আমাদের শক্তি হচ্ছে এই দেশের মানুষ। কেন জান?"

জেসিকা জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

কারণ এই দেশের মানুষের একটা খুব বড় বৈশিষ্ট্য আছে। পৃথিবীর সব দেশ আসলে শুধু একটা দেশ। সেই দেশে শুধু সেই দেশের মানুষ থাকে। জার্মানিতে থাকে জার্মানরা, ফ্রান্সে থাকে ফ্রেঞ্চরা, ইন্ডিয়াতে থাকে ইন্ডিয়ানরা, চায়নাতে থাকে চীনারা—শুধু আমেরিকাতে থাকে সব দেশের মানুষ। এখানে জার্মানরা থাকে। ফ্রেঞ্চরা থাকে। ইন্ডিয়ানরা থাকে। চাইনিজরা থাকে। বাংলাদেশিরা থাকে। ইরাকিরা থাকে। ইরানিরা থাকে। আমেরিকা আসলে একটা দেশ না, এটা আসলে ছোট একটা পৃথিবী। সব দেশের মানুষ এখানে পাশাপাশি থাকে, সবাই নিজের কালচারকে বাঁচিয়ে রাখে, আবার এখানকার কালচার গ্রহণ করে। এটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষের একটা মিলন মেলা..."

মিসেস হেনরিকসনের চোখগুলো কেমন যেন ঢুলু ঢুলু হয়ে গেল, কথা বলার সময় মনে হলো ঠিক যেন কথা বলছেন না, যেন একটা কবিতা আবৃত্তি করছেন, কিংবা নিচু গলায় গান গাইছেন! টুম্পা এর আগে এরকম মানুষ দেখেছে বলে মনে করতে পারে না। আমেরিকা দেশটা কতো মহান সেটা নিয়ে সবাই অনেক বড় বড় কথা বলে কিন্তু এরকমভাবে সে কখনো কাউকে কথা বলতে দেখে নি! টুম্পা অবাক হয়ে আবিষ্কার করল এর আগে সে যাদের আমেরিকা নিয়ে কথা বলতে শুনেছে তারা সবাই বলেছে অহংকার নিয়ে। কিন্তু মিসেস হেনরিকসন বলছেন কৃতজ্ঞতা নিয়ে। তিনি যেন কতো কৃতজ্ঞ যে পৃথিবীর সব দেশের মানুষ দয়া করে এই দেশে এসেছে! পুরো বিষয়টা যে এভাবে দেখা যায় টুম্পা আগে কখনো চিন্তা করে নি।

মিসেস হেনরিকসন হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও মা! দেখো কতো সময় বকবক করে কাটিয়ে দিলাম। মানুষ বয়স হলে এমনিতেই বেশি কথা বলে, আর তার উপরে আমি টিচার, আমি একবার মুখ খুললে আর মুখ বন্ধ করতে পারি না। অন্য কথা থাকুক, এবার তাহলে পড়ালেখার কথা বলি।"

জেসিকা বলল, "কিন্তু মিসেস হেনরিকসন, তুমি তো বলেছ তুমি জ্যামিতি জান না। তুমি কেমন করে জ্যামিতি পড়াবে?"

মিসেস হেনরিকসন চোখ মটকে বললেন, "দেখতে চাও কেমন করে পড়াব?"

একটা মজার গন্ধ পেয়ে সবাই বলল, "দেখতে চাই।"

"চমৎকার।" মিসেস হেনরিকসন একটা চক হাতে নিয়ে বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাহলে বল, জ্যামিতির জনক কাকে বলা হয়?"

ক্লাশের সবাই বলল, "ইউক্লিড।"

"চমৎকার।" মিসেস হেনরিকসন বোর্ডে চক দিয়ে লিখলেন ইউক্লিড। তারপর ঘুরে ক্লাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবারে বলো ইউক্লিড কোন দেশের মানুষ?"

ক্লাশের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলল, "গ্রিস।"

"চমৎকার! এবার তাহলে চলো আমরা দেখি গ্রিস দেশটা কোথায়! সেটা জানার জন্যে দরকার একটুখানি ভূগোল!"

মিসেস হেনরিকসনের কথা শুনে সবাই হাসতে শুরু করে। মিসেস হেনরিকসন হাসলেন না, মুখ শক্ত করে বললেন, "তার আগে দেখা যাক তোমাদের মাঝে গ্রিক কেউ আছে কি না।"

পিছন থেকে জর্জিওস তার হাত তুললো। জর্জিওসকে সবাই জর্জিওস হিসেবেই জানতো সে যে আসলে গ্রিক সেটা কেউ জানতো না। মিসেস হেনরিকসন চোখ বড় বড় করে বললেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে চমকপ্রদ জাতি হচ্ছে গ্রিক জাতি। তাদের ঐতিহ্য হচ্ছে মহান ঐতিহ্য! জ্ঞানে বিজ্ঞানে এই জাতি পৃথিবীকে যা দিয়েছে পৃথিবী তার ঋণ কখনো শোধ করতে পারবে না—"

টুম্পা আবিষ্কার করল, একটু আগে মিসেস হেনরিকসন বাংলাদেশ সম্পর্কে যে রকম সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন এখন ঠিক সেরকম গ্রিকদের নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন। এমন ভাবে বলছেন যে পুরো গ্রিক দেশটাই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। টুম্পা অবাক হয়ে দেখলো জর্জিওস নিজেও চোখ বড় বড় করে মিসেস হেনরিকসনের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছে। টুম্পা যেরকম বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু জানে না, জর্জিওসও মনে হয় গ্রিস দেশ সম্পর্কে কিছুই জানে না। মিসেস হেনরিকসন ঠিকই বলেছেন, সবাই মনে হয় নিজের দেশের কথা ভুলে এই দেশে এসে জমা হয়েছে!

টুম্পা অন্যমনস্কভাবে মিসেস হেনরিকসনের কথা শুনতে শুনতে খাতার পৃষ্ঠায় আঁকিবুকি করতে থাকে। নিজের অজান্তেই সে কখন মিসেস হেনরিকসনের ছবি আঁকতে শুরু করেছে সে জানে না। নাকের ডগায় চশমা, কৌতুহলী চোখ ঠোঁটের কোণায় একটা বিচিত্র হাসি, কাঁচাপাকা এলোমেলো

চুল, দুই হাত উপরে তুলে কথা বলছেন—

"এই মেয়ে, তুমি কী করছ?"

মিসেস হেনরিকসনের কথা শুনে টুম্পা চমকে উঠে তার কাগজটা আড়াল করার চেষ্টা করল, কিন্তু মিসেস হেনরিকসন ছবিটা দেখে ফেললেন। এগিয়ে এসে বললেন, "দেখি। দেখি।"

টুম্পার কোনো উপায় থাকল না, কাগজটা দেখাতে হলো। মিসেস হেনরিকসন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবাক হয়ে বললেন, "ও মা! তুমি কী সুন্দর ছবি এঁকেছ আমার।"

পাশে বসে থাকা এলিজাবেথ বলল, "আমাদের ঠোম্পা খুব সুন্দর ছবি আঁকে মিসেস হেনরিকসন! ঠোম্পা আমাদের ক্লাশ-আর্টিস্ট!"

টুম্পা অনেক চেষ্টা করেও তার ক্লাশের ছেলেমেয়েদেরকে টুম্পা বলানো শেখাতে পারে নি। সবাই তাকে ডাকে ঠোম্পা।

মিসেস হেনরিকসন ছবিটা তুলে সবাইকে দেখালেন, বললেন, "দেখেছ?"

জিম বলল, "এটা বেশি ভালো হয় নাই, ঠোম্পা আরও অনেক ভালো আঁকতে পারে।"

"কী বলছ ভালো হয় নাই?" মিসেস হেনরিকসন বললেন, "তোমরা শুধু ওর স্কেচটা দেখছ আসল জিনিসটা দেখছ না! সে আমার চরিত্রটাকে ধরে ফেলেছে— দেখো তাকিয়ে!"

টুম্পা কী বলবে বুঝতে পারল না, আসলে মিসেস হেনরিকসন ঠিকই বলেছেন, ছবিতে মানুষের চেহারা ফুটিয়ে তোলা সহজ। তার চরিত্রটা ছবিতে আনতে পারাটা কঠিন। টুম্পা সবসময় চেষ্টা করে একটা মানুষের আসল চরিত্রটা ছবিটার মাঝে নিয়ে আসতে, অনেকক্ষণ ধরে কাউকে লক্ষ্য করতে পারলে সে বেশ খানিকটা করতে পারে।

মিসেস হেনরিকসন বললেন, "তোমার নামটা হচ্ছে—"

"টুম্পা। টুম্পা রায়হান।"

"বাহ্। কী সুন্দর নাম। টুম্পা রায়হান।"

টুম্পা একটু অবাক হয়ে দেখলো মিসেস হেনরিকসন তার নামটা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করেছেন, অন্য কেউ হলে টুম্পা রায়হান না বলে বলতো "ঠোম্পা ড়াইহ্যান"! তবে তার নামটা আসলে সুন্দর না, তার একেবারেই পছন্দ না।

কেন জানি তার মনে হয় গুরুত্ব দিয়ে নামটা রাখা হয় নাই।

মিসেস হেনরিকসন একটু এগিয়ে এসে বললেন, "টুম্পা, তোমার এই ছবিটা আমাকে দেবে?"

"কেন দেব না!" টুম্পা থতমত খেয়ে বলল, "তুমি চাইলে একশোবার দেব। কিন্তু এই ছবিটাতো আসলে বেশি ভালো হয় নাই—আরেকটু সময় পেলে আরো ভালো করে, এঁকে দিতে পারতাম!"

"এটাই যথেষ্ট ভালো হয়েছে। তাড়াহুড়া করে তুমি যেটা এঁকেছ সেটাই আমি চাই।" মিসেস হেনরিকসন ছবিটা টুম্পার ডেস্কের উপর রেখে বললেন, "তুমি ছবির নিচে আজকের তারিখ দিয়ে একটা সিগনেচার করে দাও!"

টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "সিগনেচার?"

"হ্যাঁ, সিগনেচার। তুমি যখন অনেক বিখ্যাত হয়ে যাবে তখন আমি এটা সবাইকে দেখাব।"

টুম্পা একটু হেসে ছবির নিচে তার নামটা লিখে দিল। মিসেস হেনরিকসন তখন সেটা হাতে নিয়ে বললেন, "থ্যাংক ইউ টুম্পা। থ্যাংক ইউ ভেরিমাচ।" তারপর এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

নতুন বাবা

স্কুল বাসে টুম্পার পাশে বসেছে জেসিকা। একটা বড় চকলেটের বার চিবাতে চিবাতে বলল, "শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা কী করছ?"

শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা টুম্পা সে কিছুই করছে না কিন্তু কথাটা সে বলতে পারল না, কারণ তাকে বাসা থেকে এই আমেরিকান বন্ধুদের সাথে কোথাও যেতে দেবে না। টুম্পা সরল মুখ রেখে বলল, "শুক্রবার বাসায় একটা পার্টি আছে—বাসায় থাকতে হবে।"

'ও! আমরা সিনেমা দেখতে যাব। জনি ডেপের নতুন মুভিটা রিলিজ হয়েছে।"

"আমি মিস করব।" টুম্পা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল, জনি ডেপ তার খুব প্রিয় অভিনেতা।

"সামনের উইক এন্ডে আমরা শহরে যাব, তখন চলো আমাদের সাথে।"

"হ্যাঁ।" টুম্পা উজ্জ্বল মুখে বলল, "তখন যাব তোমাদের সাথে। অনেক মজা হবে।" টুম্পা খুব ভালো করে জানে সামনের উইক এন্ডে যখন যাবার সময় হবে তখন তাকে যেতে না পারার জন্যে আরেকটা কৈফিয়ত খুঁজে বের করতে হবে। অনেক সোজা হতো সে যদি সবাইকে সত্যি কথাটা বলে দিতে পারতো— তাহলে তাকে এই যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হতো না। কিন্তু টুম্পা কাউকে বলতে পারে না, তার বাবা-মা তাকে বিশ্বাস করে কোথাও যেতে দেয় না বলতে তার খুব লজ্জা হয়।

বাস থেকে জেসিকা নেমে যাবার পর টুম্পা বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। শহর ঘুরে ঘুরে একেবারে শহরের শেষ মাথায় তাদের বাসা। প্রত্যেকদিনই তাকে অনেকক্ষণ বাসে সময় কাটাতে হয়, তার ভালোই লাগে।

তাড়াতাড়ি বাসায় গিয়ে কী করবে? টুম্পার মনে হয় সে যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণই বুঝি সে স্বাধীনভাবে আছে। যখন বাসায় পৌছাবে তখনই তার ওপর একশরকম নিয়ম কানুন চেপে বসবে। তার বয়স এখন তেরো, এই বয়সের ছেলে মেয়েদের জন্যে এখানে কতো কী করার আছে, তার কিছুই সে করতে পারে না। ভাগ্যিস তার ছবি আঁকার সখটা ছিল তাই যখন খুব মন খারাপ হয় সে বসে বসে ছবি আঁকে। সবকিছু ভুলে যেতে পারে তখন। তা না হলে যে কী হতো—মনে হয় সে পাগলই হয়ে যেতো।

পাগল! বাসায় তাকে কথায় কথায় এই কথাটা শুনতে হয়, তার শরীরে পাগলের রক্ত আছে সে জন্যে তার সবকিছু নাকি উল্টাপাল্টা। কথাটা বলেন তার বাবা, আসল বাবা নয় তার সৎ বাবা। টুম্পার আসল বাবা নাকি পাগল ছিল, তার আম্মুকে এতো অত্যাচার করতো যে আম্মু আর না পেরে টুম্পাকে নিয়ে পালিয়ে আমেরিকা চলে এসেছেন। আসল বাবার পুরো জীবন নাকি কেটেছে পাগলা গারদে। শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। এতোদিনে নিশ্চয়ই মরে টরে গেছেন। টুম্পার নতুন বাবা বলেন যে বাংলাদেশে ভালো মানুষই বেঁচে থাকতে পারে না, পাগল বেঁচে থাকবে কেমন করে? বাংলাদেশকে নিয়ে সবসময় তার নতুন বাবাও নাক শিটকান। আজকে মিসেস হেনরিকসনের কথা শোনার আগে টুম্পা কোনোদিন বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ভালো কথা শোনে নি। টুম্পার নতুন বাবাও তো বাংলাদেশের, একটা মানুষের তার নিজের দেশের জন্যে মায়া থাকে না কেন টুম্পা কখনো ঠিক করে বুঝতে পারে না।

স্কুল বাসটা তার বাসা থেকে এক ব্লক দূরে থেমে গেল। স্কুল ব্যাগটা নিয়ে বাস থেকে নামার সময় টুম্পা হাত নেড়ে বাস ড্রাইভার মিসেস রজার্সকে বিদায় জানালো। পাহাড়ের মতো বড় মিসেস রজার্স বললেন, "সাবধানে থেকো সোনা। কাল আবার দেখা হবে!"

একেবারেই সাধারণ গৎবাধা স্নেহের কথা কিন্তু শুনে টুম্পার বুকের ভেতর টন টন করে ওঠে, তার বাসায় কেউ তাকে এই নরম কথাগুলো বলে না। সত্যিকারের বাবার কথা তার একটুও মনে নেই, নতুন বাবার সাথে বিয়ে হওয়ার আগে তার আম্মু তাকে খুব আদর করতেন, বিয়ে হয়ে যাবার পর সব কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল। টুম্পার বয়স তখন মাত্র ছয় কিছুতেই সে বুঝতে পারছিল না কেন তার আম্মুকে অচেনা একটা মানুষকে বিয়ে করতে

হবে। বিয়ের দিন কী কান্নাটাই না কেঁদেছিল এখনো মনে আছে। তার নতুন বাবাকে সে ভয় পেতো, ছোট বাচ্চারা সব কিছু নিজেদের মতো করে বুঝতে পারে সেও বুঝেছিল এই মানুষটা তাকে পছন্দ করে না। হাসি হাসি মুখ করে তাকে আদর করার ভান করতেন কিন্তু তার মাঝে কোনো ভালোবাসা ছিল না।

তার ছোট ভাই লিটনের জন্ম হ'ল এক বছর পর, তার নতুন বাবা আর আম্মু লিটনকে নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে টুম্পা বলে যে কেউ আছে সেটা যেন কারো মনেই থাকলো না। সে যখন আরো ছোট ছিল তখন তার খুব হিংসে হতো, এখন একটু বড় হয়েছে এখন আর হিংসে হয় না, মাঝে মাঝে একটু অভিমান হয়। তবে লিটনকে সে খুব আদর করে। মনে হয় তার নতুন বাবা আর আম্মু থেকে সেই লিটনকে বেশি আদর করে।

টুম্পার কাছে বাসার একটা চাবি আছে, দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখে লিটন একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে ছোটাছুটি করছে, টুম্পাকে দেখে গুলি করতে করতে তার দিকে ছুটে এল। টুম্পাও তার দুই হাতকে দুটো পিস্তল বানিয়ে লিটনকে গুলি করার ভান করে। তারপর ব্যাগটা নিচে রেখে সে লিটনের পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে ঘাড়ে তুলে নিয়ে কাতুকুতু দেয়, লিটন হাত পা ছুঁড়ে হাসতে হাসতে আনন্দে চিৎকার করতে থাকে।

আম্মু রান্নাঘর থেকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, "টুম্পা, মা এসেছিস?"

টুম্পার কী মনে হলো কে জানে, বাংলায় উত্তর দিলো, বলল, "হ্যাঁ, আম্মু এসেছি।"

বাসায় তার নতুন বাবা আর আম্মু সবসময় বাংলায় কথা বলেন, টুম্পা যখন ছোট ছিল সেও খুব সুন্দর বাংলা বলতে পারতো। যতোই বড় হচ্ছে বাংলাতে দখল কমে আসছে। লিটন এখন পরিষ্কার বাংলায় কথা বলে, স্কুলে যেতে শুরু করা মাত্রই আস্তে আস্তে বাংলা ভুলে যেতে শুরু করবে।

আম্মু বললেন, "হাত মুখ ধুয়ে আয়। কিছু খাবি।"

টুম্পা লিটনকে ঘাড় থেকে নামিয়ে স্কুল ব্যাগটা তুলে নিজের ঘরে গেল। ছোট এই ঘরটাই হচ্ছে তার পৃথিবী, ভাগ্যিস তার নিজের এই ছোট একটা পৃথিবী আছে যেখানে এসে সে সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। টেবিলে তার কম্পিউটার, দেওয়ালে ফ্রেন্ডস এর একটা পোস্টারে রস, জোয়ী, মনিকা, চ্যান্ডলার, র‍্যাচেল আর ফিবি গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে। টুম্পার

নতুন বাবা তার ঘরে খুব বেশি আসেন না। যখন আসেন তখন এই পোস্টারটা দেখে খুব বিরক্ত হন আর বিড় বিড় করে বলেন, "এটা ঘরে টানানোর একটা জিনিষ হলো? ছিঃ!" ভাগ্যিস তার নতুন বাবা কোনোদিন টেলিভিশনে ফ্রেন্ডস দেখেন নি, যদি দেখতেন তাহলে নির্ঘাত পোস্টারটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতেন। টুম্পা জানালায় পর্দা টেনে দেয়, পিছনে একটা ছোট বনের মতো, সেখানে অনেকগুলো পাইন গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। এই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে টুম্পার খুব ভালো লাগে। তার কাছে সবচেয়ে সুন্দর লাগে যখন তুষারে সবকিছু ঢেকে যায়, পৃথিবীতে কী এর চাইতে সুন্দর কোনো দৃশ্য আছে?

টুম্পা বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিচে নেমে আসে। আম্মু রান্নাঘরের ছোট টেবিলে এক স্লাইস পিতজা গরম করে রেখেছেন। পিতজার দোকানে গরম গরম পিতজা খেতে খুব মজা কিন্তু ফ্রিজ থেকে বের করে আনা পিতজার মতো জঘন্য আর কী হতে পারে? টুম্পা অবশ্যি কিছু বলল না, ফ্রিজ থেকে কোকের বোতল বের করে এক গ্লাস কোক নিয়ে পিতজার স্লাইসটা খেতে থাকে। একটা খাবার যত অখাদ্যই হোক কোকের সাথে সেটা খেয়ে ফেলা যায়।

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "স্কুল কেমন হলো?"

"ভালো।" টুম্পার হঠাৎ করে মিসেস হেনরিকসনের কথা মনে পড়ল। বলল, "আচ্ছা আম্মু তুমি কী জর্জ হ্যারিসনের কনসার্টের কথা জান? বাংলাদেশের উপর হয়েছিল। উনিশশো একাত্তর সালে?"

আম্মুকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, ইতস্তত করে বললেন "ও আচ্ছা! মনে হয় শুনেছি। অনেক আগের ব্যাপার—"

"তুমি কী জেসোর রোড কবিতাটা পড়েছ?"

"কী রোড?"

"জেসোর। জেসোর রোড।"

"কে লিখেছে?"

"এলেন গিনসবার্গ।"

আম্মু ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে থাকেন। হঠাৎ করে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বললেন, "ও আচ্ছা, যশোর রোড। যশোরকে জেসোর বললে আমি

বুঝব কেমন করে!"

"যশোর রোড কী?"

"যশোর হচ্ছে বাংলাদেশের একটা শহর। সেই শহর থেকে যে রাস্তাটা গেছে সেটা হচ্ছে যশোর রোড।"

টুম্পা পিতজা স্লাইসের শেষ টুকরোটা মুখে জোর করে ঠেসে দিয়ে বলল, "তুমি কবিতাটা পড় নি?"

"নাহ্।" আম্মু মাথা নাড়লেন, "ইংরেজি কবিতা আর কয়টা পড়েছি। তবে এটার উপর মৌসুমী ভৌমিকের একটা গান আছে সেটা শুনেছি।"

"বাসায় আছে সেটা আম্মু?"

"থাকার কথা। খুঁজে দেখ।" আম্মু একটু অবাক হয়ে বললেন, "তুই কবে থেকে বাংলা গানের জন্যে এত পাগল হয়ে গেলি?"

"না পাগল হই নাই। আজকে স্কুলে একজন বললেন তো তাই শুনতে চাচ্ছিলাম।"

"কী বলেছে?"

"বাংলাদেশের কথা।"

"আমেরিকান মানুষ?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। মিসেস হেনরিকসন। আমাদের সাবস্টিটিউট টিচার।"

আম্মু মুখ শক্ত করে বললেন, "বন্যা সাইক্লোন এইসব নিয়ে কথা বলেছে নিশ্চয়ই।"

টুম্পা মাথা নাড়ল। আম্মু বললেন, "তাই হবে। কবে যে দেশটা ঠিক হবে—এই দেশ নিয়ে কেউ ভালো একটা কথা বলতে পারে না।"

টুম্পা বলল, "আসলে মিসেস হেনরিকসন, বাংলাদেশ নিয়ে ভালো ভালো কথাই বলেছেন।"

"ছাই বলেছে। বন্যা সাইক্লোন নিয়ে কথা বললে ভালো কথা বলা হলো? এগুলো ভালো কথা?"

টুম্পা আর তর্ক করল না। সিডির স্তূপ থেকে মৌসুমী ভৌমিকের গানের সিডিটা খুঁজে বের করে সে নিজের রুমে এনে যশোর রোড গানটি শুনল। এতো সুন্দর গানের কথাগুলো, আর মৌসুমী ভৌমিক এতো সুরেলা গলায়

এতো দরদ দিয়ে গানটি গেয়েছে যে টুম্পার মনে হলো সে বুঝি পুরো দৃশ্যটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। সে ভাসা ভাসা ভাবে জানে ঊনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, প্রায় এক কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছিল, মানুষ মারা গিয়েছিল তিরিশ লক্ষ, কিন্তু সেই দুঃখ কষ্ট আর যন্ত্রণার বিষয়টা সে আগে কখনোই ঠিক করে অনুভব করে নি। এই গানটা শুনতে শুনতে মনে হলো সে প্রথমবারের মতো সেটা অনুভব করল। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে তার একটা দেশ আছে, সেই দেশের মাটিতে তার জন্ম হয়েছিল, সেটাই তার জন্মভূমি। দেশটা ঠিক তার মতোই দুঃখী! অনেক কষ্ট করে সেই দেশের জন্ম হয়েছিল এখন সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে অনেক কষ্ট করছে! ঠিক কী কারণ জানা নেই, যে দেশটিকে সে দেখেনি শুধু মাত্র সেই দেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছিল বলে টুম্পা তার বুকের ভেতর সেই দেশটির জন্যে গভীর এক ধরনের মমতা অনুভব করতে থাকে।

টুম্পার ক্লাশের বন্ধু বান্ধবেরা যখন মলে দুবার চক্কর খেয়ে সিনেমা হলে ঢুকেছে জনি ডেপের শেষ সিনেমাটা দেখার জন্যে তখন টুম্পা তার ছোট ঘরটায় কম্পিউটারের সামনে বসে রইলো। ইন্টারনেটে বাংলাদেশ নিয়ে যত রকম তথ্য পাওয়া যায় সে এক ধরনের ছেলেমানুষী আগ্রহ নিয়ে সেগুলো দেখতে থাকে। টুম্পা অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো এই দেশটিকে টিকিয়ে রেখেছে এই দেশের গরিব মানুষেরা, যারা চাষবাস করে, গার্মেন্টসে কাজ করে কিংবা দেশে বিদেশে গিয়ে ছোটখাটো কাজ করে। আর দেশটাকে লুটেপুটে খায় বড়লোকেরা, মন্ত্রীরা, ব্যবসায়ীরা! এতো কষ্টের দেশকে টিকিয়ে রাখছে গরিব মানুষেরা আর লুটেপুটে খাচ্ছে বড়লোকেরা সেটা পড়েই টুম্পার রক্ত কেন জানি গরম হয়ে উঠতে থাকে!

রাত্রে খাবার টেবিলে দেখা গেল টুম্পার নতুন বাবার মেজাজ খুব খারাপ। মাঝে মাঝে অফিসে কিছু একটা ঝামেলা হয় আর সেই রাগটা বাসায় এসে লিটন আর টুম্পার উপর ঝাড়েন। আজকেও তাই হলো, লিটন প্লেটের ভাতগুলোকে একটা পাহাড়ের মতো বানিয়ে তার উপরে একটা চামুচ বসিয়ে সেটাকে মেশিনগান বানিয়ে গুলি করছিল আব্বু তখন তাকে ধমক দিলেন, "কী হচ্ছে লিটন? খাবার নিয়ে খেলা?"

লিটন এখনো একটু গাধা রয়ে গেছে কখন চুপ করে থাকতে হয় শেখে নি,

বাবাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বললো, "কী হয় আব্বু খাবার নিয়ে খেললে?"

বাবা একটু থতমত খেয়ে গেলেন, গম্ভীর হয়ে বললেন, "পৃথিবীতে এতো মানুষ না খেয়ে থাকে সেই খাবার নিয়ে খেলতে হয় না।"

"কোন মানুষ না খেয়ে আছে আব্বু?"

"বাংলাদেশেই লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে আছে।"

টুম্পা এতোক্ষণ ইন্টারনেটে বসে বসে বাংলাদেশের উপর গবেষণা করে এসেছে কাজেই সে একটু প্রতিবাদ না করে পারল না, বলল, "না বাবা, বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।"

বাবা চোখ পাকিয়ে বললেন, "তুই কেমন করে জানিস?"

"ইন্টারনেটে দেখেছি।"

বাবা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ঐ সব হচ্ছে বাকোয়াজ। বাংলাদেশে কী আছে? না আছে কোনো ইন্ডাস্ট্রি, না আছে কোনো তেল, না আছে কোনো রিসোর্স—আছে শুধু চোর আর বাটপার। যদি চোর আর বাটপার এক্সপোর্ট করা যেতো তাহলে বাংলাদেশ এতোদিনে বড়লোক হয়ে যেতো!" কথা শেষ করে আব্বু হা হা করে হেসে উঠলেন যেন খুব মজার কথা বলেছেন।

লিটন জিজ্ঞেস করল, "চোর, বাটপার কেমন করে এক্সপোর্ট করে আব্বু?"

টুম্পা বলল, "ধুর গাধা! যেটা বুঝিস না সেটা নিয়ে কথা বলিস না।"

আম্মু বললেন, "কী যে হবে দেশটার। যখনই খোঁজ নিই শুনি হরতাল আর অবরোধ—"

টুম্পা আস্তে আস্তে বলল, "এই সব গোলমালের মাঝেও বাংলাদেশের গ্রোথ ছয় পার্সেন্ট।"

বাবা বললেন, " দেশটা টিকে আছে ভিক্ষার উপর। আমেরিকা ইউরোপ যদি ফরেন এইড না দিতো তাহলে এতোদিনে দেখতে কী হতো। সব বঙ্গোপসাগরে ভেসে যেতো।"

টুম্পা বলল, "না বাবা। বাংলাদেশে ফরেন এইড হাফ বিলিয়ন থেকে কম! গার্মেন্টস-এর এক্সপোর্ট হচ্ছে আট বিলিয়ন। মিডল ইস্টের শ্রমিকেরা পাঠায় আট বিলিয়ন।"

বাবা মুখ শক্ত করে বললেন, "তুই কেমন করে জানিস?"

"ইন্টারেনটে দেখেছি।"

বাবা একটু থতমত খেয়ে বললেন, "ঐ বিলিয়ন ডলারের হিসাব দিয়ে লাভ নেই। ঐ বিলিয়ন ডলার হচ্ছে খালি কাগজে কলমে। আসলে সব ফক্কা। আমি ঐ দেশটা দেখেছি। আমি জানি দেশটা হচ্ছে চোরের দেশ। সবাই চোর। তুই জানিস আমার জমিটা বিক্রি করার জন্যে কতো টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল?"

টুম্পার খুব ইচ্ছে করল বলতে, "তুমি যদি ঘুষ দাও তাহলে তো তুমিও চোর" কিন্তু সে বলল না—বললে তার ধড়ে আর মাথা থাকবে না।

জমি বিক্রি করার জন্যে বাবার কতো টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল সেটা জানার জন্যে টুম্পা কোনো প্রশ্ন করলো না দেখে বাবা মনে হয় আরেকটু রেগে গেলেন, বললেন, "আমার কোনো কথা তোর বিশ্বাস হয় না—বিশ্বাস হয় তোর ইন্টারনেট?"

টুম্পা বুঝলো এখন কোনো কথা বললে আরো বিপদ হয়ে যাবে তাই সে চুপ করে রইলো। বাবা বললেন, "এতোই যদি বাংলাদেশের উপর বিশ্বাস তাহলে এই দেশে পড়ে আছিস কেন? চলে যা বাংলাদেশে! গার্মেন্টসে কাজ কর গিয়ে।"

টুম্পা এবারেও কোনো কথা বলল না। বাবা তখন আরো রেগে গেলেন, বললেন, "শেষবার যখন গিয়েছি তখন দেখেছি, দেশটা যে শুধু চোর বাটপারের দেশ তা না, দেশটা হচ্ছে ময়লা আবর্জনার দেশ। মশা মাছি আর পোকা মাকড়ের দেশ। ফকির আর ফকিরনীর দেশ—"

টুম্পার ঠিক কী হলো কে জানে, সে ফিস ফিস করে বলল, "আমার খুব বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছা করে।"

বাবা অবাক হয়ে বললেন, "কী বললি?"

টুম্পা মুখ তুলে একবার তার বাবা আরেকবার তার আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার খুব বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছে করে।"

কিছু না বুঝে লিটনও বললো, "আমারও যেতে ইচ্ছা করে।"

আব্বু চোখ পাকিয়ে লিটনের দিকে তাকালেন, লিটন সাথে সাথে বলল, "ডিজনিল্যান্ডেও যেতে ইচ্ছা করে।"

বাবা খাওয়া থামিয়ে টুম্পাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কেন বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছে করে?"

"দেখতে।"

"কী দেখতে?"

"সব কিছু।" একটু থেমে বলল, "বাংলাদেশে নাকি খুব সুন্দর বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে সুন্দর।"

বাবা জোর করে একটু হাসার মতো শব্দ করলেন, তারপর আম্মুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, " তোমার মেয়ের কথা শোনো! সে নাকি বৃষ্টি দেখতে যাবে বাংলাদেশ! মাথা খারাপ আর কাকে বলে!"

আম্মু বললেন, "নিজের দেশ দেখার সখ তো থাকতেই পারে!"

বাবা বললেন, "না! নিজের দেশটা যদি হয় বাংলাদেশ তাহলে সেই সখ থাকে শুধু পাগলের—" বাবা হঠাৎ করে থেমে গেলেন তারপর কিছু একটা মনে পড়েছে সেরকম ভান করে বললেন, "হয়তো সেটাই ঘটেছে! হাজার হলেও বাপের রক্ত আছে শরীরে। পাগলামির বীজ তো আসতে হবে কোথা থেকে!" খুব বড় ধরনের রসিকতা হয়েছে এরকম ভান করে আব্বু হা হা করে হাসতে লাগলেন। নির্মম আনন্দহীন হাসি।

টুম্পা মাথা নিচু করে খাওয়ার ভান করতে থাকে। লিটন টুম্পার হাত ধরে বলল, "পাগলামির বীজ মানে কী আপু?"

আর্ট কম্পিটিশন

টুম্পা যখন তার নতুন বাবাকে বলেছিল যে তার খুব বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছে করে সে কিন্তু সেটা খুব ভেবেচিন্তে বলে নি—কিন্তু সেই কথাটি বলার কারণে বাসায় তার অবস্থাটা আগের থেকে খারাপ হয়ে গেল। বাবা এখন সময়ে অসময়ে সেটা দিয়ে তাকে খোটা দেন। যেমন সবাই মিলে খেতে বসেছে, তখন বাবা বলবেন, "আমাদের টুম্পার বাংলাদেশে কী হয়েছে তোমরা শুনেছ?"

বাধ্য হয়ে তখন কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয়, "কী হয়েছে?"

বাবা তখন হাত পা নেড়ে বলেন, "একটা লঞ্চ বোঝাই করে মানুষ নিয়ে যাচ্ছে, কথা নাই বার্তা নাই মেঘনার মাঝখানে সেটা মার্বেলের মতো ডুবে গেল। পাঁচশ মানুষ শেষ।"

আম্মু তখন বলেন, "আহারে!"

আব্বু বিরক্ত হয়ে বলেন, "রাখো তোমার আহারে! ঐ দেশে কোনো নিয়ম কানুন আছে নাকি? কোনো সেফটি রুল আছে নাকি? মানুষ মরবে না তো কী? কারো কোনো মাথ্যা ব্যথা আছে?"

আম্মু বলেন, "তবুও তো। এতোগুলো মানুষ—"

নতুন বাবার চোখ তখন উত্তেজনায় চক চক করতে থাকে, ষড়যন্ত্রীর মতো বলেন, "এতোগুলো মানুষ যে মরেছে সেটা এই দেশের কোনো নিউজে শুনেছ? পত্রিকায় দেখেছ? দেখ নাই।"

এটা অবশ্যি সত্যি কথা এই দেশের কোথাও সেই খবর ছাপা হয় না। বাবা সেটা নিয়েও টিটকারি মারেন, বলেন, "কেন নাই জান? কারণ বাইরের দুনিয়া বাংলাদেশের মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করে না। কেন করবে? তারা কী মানুষ হবার যোগ্য হয়েছে?"

টুম্পার ইচ্ছে হয় সে বলে, "বাবা এই সমস্যাটা তো বাংলাদেশের নয় সমস্যাটা এই দেশের মানুষের। এতো বড় দুদর্শার খবর তারা শুনতে চাইবে না কেন?" কিন্তু টুম্পা কিছু বলে না।

আবার কয়েকদিন পর নতুন বাবা মুখে এক গাল হাসি নিয়ে বলেন, "টুম্পার বাংলাদেশে কী হয়েছে শুনেছ?"

কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে?"

"চারদিন ধরে টানা হরতাল। সারা দেশের মানুষ ঘরে বসে হিন্দি সিনেমা দেখছে। আর রাস্তায় রাস্তায় মারপিট—"

আম্মু জানতে চান, "কেন? কী হয়েছে?"

বাবা হাত নেড়ে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "সেই খবর কে জানে! বাংলাদেশের কোনো মাথামুণ্ডু আছে নাকি?" তারপর টুম্পার দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুই যে সারাক্ষণ বাংলাদেশ বাংলাদেশ করিস তোকে আসলেই একবার বাংলাদেশ পাঠানো উচিৎ। এক সপ্তাহের মাঝে সিধে হয়ে যাবি।"

টুম্পা তখন বলে, "আমার মনে হয় ভালোই লাগবে। বাংলাদেশের সংসদ ভবন হচ্ছে সারা পৃথিবীর মাঝে বিখ্যাত। লুই কান ডিজাইন করেছেন, দূর দূর দেশ থেকে মানুষ সেটা দেখতে আসে—"

আব্বু চোখ পাকিয়ে বলেন, "কংক্রিটের একটা দালান এর মাঝে দেখার কী আছে? দেখার মতো জিনিস হচ্ছে তাজমহল, পুরোটা শ্বেতপাথরের তৈরি। কোথায় শ্বেত পাথর আর কোথায় কংক্রিট!"

টুম্পা তার নতুন বাবার সাথে তর্ক করে না। বাবা তখন গজ গজ করে বলেন, "প্লেনের ভাড়া অনেকগুলো টাকা তা না হলে আমি সত্যিই তোকে বাংলাদেশ পাঠাতাম।"

টুম্পা তখন বলে, "আমি টাকা জমাচ্ছি। যখন প্লেনের টিকেটের টাকা হবে তখন আমি নিজেই যাব।"

"গিয়ে কী করবি শুনি?"

"পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যাংগ্রোভ ফরেস্ট হচ্ছে বাংলাদেশে। সুন্দরবন। সেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার থাকে। সেই বাঘ দেখব।"

লিটন তখন বলে, "আমিও যাব। আমিও বাঘ দেখব।"

টুম্পা বলে, "আমি যখন বড় হবো অনেক টাকা হবে, তখন তোকে নিয়ে যাব। এখন পারব না।"

"কেন পারবে না, কেন নেবে না—" বলে লিটন এখন টুম্পার সাথে ঝগড়া শুরু করে দেয়। বাবা ভুরু কুঁচকে টুম্পার দিকে তাকিয়ে থাকেন, বিড় বিড় করে বলেন, "পাগলামি রোগ বংশগত। জিনেটিক। আমি আগেই বলেছি না?"

আমেরিকার ইতিহাস ক্লাশ শেষে পি.এ. সিস্টেমে অফিস থেকে টুম্পাকে ডেকে পাঠালো তার একটা চিঠি নিয়ে নেবার জন্যে। স্কুলের চিঠিপত্র সাধারণত লাইব্রেরির বই ফেরত দেওয়া, গার্জিয়ানদের মিটিং এই সব নিয়ে হয়, গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় কিন্তু তবুও টুম্পা তখন তখনই চিঠিটা নিয়ে এল। খামের উপর তার নামটি হাতে লেখা, খামটি খুলে দেখে একটা খবরের কাগজের ক্লিপিং সাথে এক টুকরো সাদা কাগজে একটা চিঠি। চিঠিটা লিখেছেন মিসেস হেনরিকসন। চিঠিতে লেখা :

প্রিয় টুম্পা

সামনের উইক এন্ডে আটলান্টিক সিটিতে একটা ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হবে। তোমার সাথে কথা না বলেই আমি তোমাকে সেখানে রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছি। তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বর বি ৫২৫৩, তুমি অবশ্যিই সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাবে।

তুমি হয়তো জান না, কিন্তু তুমি আসলে একজন অসাধারণ শিল্পী!

ক্রিস্টিনা হেনরিকসন

টুম্পা একটু অবাক হয়ে চিঠিটা আরেকবার পড়লো, তারপর খবরের কাগজের ক্লিপিংটা দেখলো। প্রতিযোগিতা তিন ক্যাটাগরিতে যাদের বয়স পাঁচ থেকে দশ তারা ক্যাটাগরি এ, যাদের বয়স দশ থেকে পনেরো তারা ক্যাটাগরি বি এবং যাদের বয়স পনেরো থেকে বিশ তারা ক্যাটাগরি সি। টুম্পার বয়স চৌদ্দ তাই সে ক্যাটাগরি বি। রেজিস্ট্রেশন ফী বিশ ডলার, মিসেস হেনরিকসন সেটা দিয়ে দিয়েছেন!

চিঠিটা হাতে নিয়ে ক্লাশে ফিরে আসতেই জেসিকা জিজ্ঞেস করলো, "কিসের চিঠি? প্রিন্সিপালের?" দাঁত বের করে হেসে বলল, "মাতাল অবস্থায়

স্কুলে আসার অপরাধে স্কুল থেকে বহিষ্কার?"

টুম্পা হাসল, বলল, "অনেকটা সেরকম!"

"তবু শুনি।"

টুম্পা বলতে চাইছিল না, কারণ সে জানে তাকে বাসা থেকে কিছুতেই আটলান্টিক সিটি নিয়ে যাবে না। সে যে ছবি আঁকে বাসায় সেটাও ভালো চোখে দেখা হয় না। কিন্তু জেসিকা খুব কৌতূহলী মেয়ে সবারই সবকিছু তার জানা চাই। তাই টুম্পাকে চিঠিটা দেখাতে হলো! চিঠি পড়ে সে ক্লাশে হৈ চৈ শুরু করে দিল, এবং তখনই ডজন খানেক ছেলেমেয়ে টুম্পার সাথে আটলান্টিক সিটি যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। টুম্পা যখন ছবি আঁকবে তখন তারা পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নেচে কুদে তাকে উৎসাহ দেবে। টুম্পা এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকে, আসলে সে যেতে পারবে না এবং সেই কথাটি কীভাবে ক্লাশের সবাইকে বলবে সে জানে না।

সেদিন রাত্রি বেলা টুম্পা তবুও একবার চেষ্টা করল। খাবার টেবিলে বাবা বাংলাদেশের ফতোয়াবাজ একজনের গল্প শেষ করে হা হা করে হাসছেন তখন টুম্পা বলল, "আটলান্টিক সিটিতে একটা আর্ট কম্পিটিশন হচ্ছে, আমি কী সেখানে যেতে পারি?"

বাবা হাসি থামিয়ে বললেন, "কোথায়?"

"আটলান্টিক সিটিতে।"

বাবা পরিষ্কার শুনেছেন তবুও না শোনার ভান করে বললেন, "কোথায়?"

"আটলান্টিক সিটিতে।"

বাবা মুখ শক্ত করে বললেন, "আটলান্টিক সিটি হচ্ছে জুয়াখেলার জায়গা। তুই আটলান্টিক সিটি যেতে চাচ্ছিস মানে?"

"সেখানে একটা আর্ট কম্পিটিশন হচ্ছে—"

আব্বু বাধা দিয়ে বললেন, "এই দেশে ঢেকুর তোলার কম্পিটিশন হয় হাঁচি মারার কম্পিটিশন হয় তার মানে তুই তার সবগুলোতে যেতে থাকবি?"

টুম্পার আর কথা বলার ইচ্ছে করল না, সে চুপ করে গেল। বাবা তখন আরেকটু রেগে গেলেন, বললেন, "আর্ট-ফার্ট এগুলো মাথা থেকে দূর কর। দুনিয়াটা কঠিন জায়গা আর্ট-ফার্ট দিয়ে এখানে কিছু হয় না। মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর যেন কোনো একটা চাকরি বাকরি পাস। বুঝলি?"

টুম্পা মাথা নেড়ে জানালো যে সে বুঝেছে। বাবা এখন গজগজ করতে

লাগলেন, বললেন, "আমি বুঝতে পারি না তোদের এতো সময় কেমন করে হয় যে যত অ-জায়গা কু-জায়গার খোঁজখবর নেওয়ার সময় হয়।"

টুম্পা তখন না বলে পারল না, "আমি এর খোঁজ নিই নাই।"

"তাহলে এর খোঁজ পেলি কেমন করে?"

টুম্পা কোনো কথা না বলে তখন তার ঘর থেকে মিসেস হেনরিকসনের চিঠিটা এনে নতুন বাবাকে দিলো। বাবা চিঠিটা পড়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ক্রিস্টিনা হেনরিকসন কে?"

"আমাদের স্কুলের একজন সাবস্টিটিউট টিচার।"

"ও।"

আম্মু তখন বাবার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়লেন, পড়ে বললেন, "কোথাও তো যায় না। নিয়ে যাই না হয় কম্পিটিশনে। আমি ড্রাইভ করে নিয়ে যাব—"

বাবা চোখ লাল করে বললেন, "এই বাসায় আমি আর্ট ফার্ট ঢুকতে দেব না। বুঝেছ?"

আম্মু চুপ করে গেলেন।

বিষয়টা এখানেই শেষ হবার কথা কিন্তু শেষ হলো না। পরদিন স্কুল থেকে বাসায় এসে তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছে। বাসায় কেউ নেই, আম্মু মনে হয় লিটনকে নিয়ে গ্রোসারি সেন্টারে গিয়েছেন। টুম্পা ফ্রিজ খুলে একটা হট ডগ বের করে মাইক্রোওয়েভে গরম করছে তখন টেলিফোন বাজলো। ফোন ধরে দেখে অন্যপাশে মিসেস হেনরিকসন। মিসেস হেনরিকসন খুশি খুশি গলায় বললেন, "টুম্পা! কী খবর তোমার?"

"ভালো মিসেস হেনরিকসন। থ্যাংক ইউ।"

"তুমি আসছ তো আটলান্টিক সিটিতে? এটা খুব প্রেস্টিজিয়াস কম্পিটিশান। তোমার খুব কপাল ভালো এই বছর এটা আটলান্টিক সিটিতে হচ্ছে। দিনে দিনে ঘুরে চলে আসতে পারবে। মায়ামী না হয় লাসভেগাসে হলে কী করতে?"

টুম্পা ইতস্তত করে বলল, "তা ঠিক।"

"ঠিক আছে, তাহলে দেখা হবে—"

মিসেস হেনরিকসন টেলিফোন রেখে দিচ্ছিলেন, টুম্পা তাকে থামাল, বলল, "মিসেস হেনরিকসন, মিসেস হেনরিকসন—"

"কী হলো?"

"আসলে, আসলে—"

"আসলে কী?"

"আসলে আমার যাওয়া হবে না।"

"ও!" মিসেস হেনরিকসন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "অন্য কোনো প্রোগ্রাম আছে?"

"না, সেরকম কিছু না।" টুম্পা ইতস্তত করে ঠিক কী বলবে বুঝতে পারে না।

"তাহলে?"

"আসলে আমার বাসা থেকে যেতে দেবে না।"

কথাটা বুঝতেই মিসেস হেনরিকসনের একটু সময় লেগে গেল। বোঝার পর জিজ্ঞেস করলেন, "কেন যেতে দেবে না?"

টুম্পার মনে হলো ধানাই পানাই না করে সত্যি কথাটাই বলে দেয়া ভালো, বলল, "আসলে আমার বাবা-মা আমাকে কোথাও যেতে দেয় না।"

"কোথাও যেতে দেয় না?"

"না। স্কুল আর বাসা ছাড়া আমি কোথাও যেতে পারি না।"

"কেন?"

টুম্পা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, "আমি জানি না। তারা অন্য কালচারের মানুষ, এই কালচারকে ভয় পায়। আমার বাবা আর আম্মুর ধারণা আমি, আমি—"

"বুঝেছি।" মিসেস হেনরিকসন বললেন, "আমি দেখেছি এরকম আগেও।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মিসেস হেনরিকসন, কিন্তু বুঝতেই পারছ। আমার কিছু করার নেই।"

মিসেস হেনরিকসন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "টুম্পা।"

"হ্যাঁ, মিসেস হেনরিকসন।"

"আমি কী তোমার বাবার সাথে কথা বলে দেখব?"

"কোনো লাভ হবে না। উল্টো—"

"উল্টো কী?"

টুম্পা বলল, "উল্টো হয়তো তোমাকে কিছু একটা বলে দেবেন। আমার

খুব লজ্জা লাগবে তখন।"

মিসেস হেনরিকসন শব্দ করে হাসলেন, বললেন, "তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা করো না। আমাকে কেউ কিছু বললে আমি কিছু মনে করি না। তোমার বাবার টেলিফোন নাম্বারটা দাও।"

টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে টুম্পা ইতস্তত করে বলেই ফেলল, "মিসেস হেনরিকসন, আমার বাবা আমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলে ফেলতে পারেন, তুমি তার সবকিছু বিশ্বাস করো না।"

"কী বলবে?"

"আমার এই বাবা আসলে আমার মায়ের দ্বিতীয় হাজব্যান্ড। আমার আসল বাবা ছিলেন প্রথম হাজব্যান্ড। সেই বাবার কথা আমার কিছু মনে নেই, কিন্তু শুনেছি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তাই আমার নতুন বাবা সবসময় আমাকে বলেন আমার শরীরে পাগলের রক্ত আছে—"

মিসেস হেনরিকসন থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ননসেন্স! যত্তোসব বাজে কথা। তুমি এই সব কথা বিশ্বাস করো না তো?"

"আমি বিশ্বাস করতে চাই না।"

"গুড। শোনো—তুমি আমার টেলিফোন নাম্বারটা লিখে রাখো, যদি কখনো দরকার হয় আমাকে ফোন করবে। যে কোনো দরকার—"

"থ্যাংক ইউ মিসেস হেনরিকসন।"

মিসেস হেনরিকসন তার ফোন নম্বরটা দিয়ে টেলিফোনটা রেখে দিলেন।

নতুন বাবা বিকেলে যখন অফিস থেকে এলেন তখন তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। রাগে থম থম করছে। কোনো কথা না বলে বসে বসে টেলিভিশনে হিস্ট্রি চ্যানেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাহিনী দেখতে লাগলেন, নতুন বাবা জন্মেও এই সব দেখেন না— দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে মেজাজ খারাপ। খাবার টেবিলেও কিছু না বলে খেতে লাগলেন, হাত ধুয়ে উঠে যাবার আগে আম্মুকে বললেন, "টুম্পার একজন টিচার কালকে সকালে টুম্পাকে তুলে নিয়ে যাবে।"

আম্মু বললেন, "কোন টিচার?"

"নাম ভুলে গেছি।"

"কেন তুলে নেবে? কোথায় তুলে নেবে?"

"কী যেন একটা আর্ট কম্পিটিশনে।"

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "আটলান্টিক সিটিতে?"

নতুন বাবা থমথমে মুখে বললেন, "হ্যাঁ।" তারপর উঠে বেডরুমে ঢুকে গেলেন। লিটন আম্মুর পিছনে ঘুরঘুর করে বলতে লাগলো, "আমি যাব আম্মু। আমিও আটলান্টিক সিটি যাব।"

খুব ভোর বেলা একটা বড় ভ্যানে করে মিসেস হেনরিকসন টুম্পাদের বাসায় হাজির হলেন। দুবার চাপা স্বরে হর্ন দিতেই টুম্পা তার ব্যাগ নিয়ে নিচে নেমে এল, মিসেস হেনরিকসন চোখ নাচিয়ে বললেন, "কী খবর আমাদের আর্টিস্ট? কম্পিটিশনের জন্যে রেডি?"

টুম্পা একটু হাসির ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। মিসেস হেনরিকসন দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "নাও, ওঠো।"

টুম্পা মিসেস হেনরিকসনের পাশে বসলো, সাথে সাথে মিসেস হেনরিকসন ভ্যান ছেড়ে দিলেন। টুম্পা সিট বেল্ট বেঁধে নিয়ে বললো, "তুমি আমার বাবাকে কী বলেছিলে মিসেস হেনরিকসন?"

"কেন?"

"আমাকে তোমার সাথে যেতে দিচ্ছেন—এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার। তাছাড়া—"

"তাছাড়া কী?"

"তাছাড়া কাল রাতে আমার বাবার মেজাজ অসম্ভব খারাপ ছিল। মনে হচ্ছিল আমাকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলবেন। তুমি কী বলেছিলে?"

মিসেস হেনরিকসন হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বললেন, "বিশেষ কিছু বলি নাই। শুধু একটু আইনের ভয় দেখিয়েছি।"

"আইনের ভয়?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা কী রকম?"

"বলেছি যে একজন ছেলে বা মেয়েকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাসায় আটকে রাখা আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ। আমি একজন সার্টিফাইড টিচার যদি এডুকেশান বোর্ডের কাছে অভিযোগ করি তাহলে স্টেট একশন নিতে পারে—এইসব আগডুম বাগডুম!"

টুম্পা হি হি করে হেসে বলল, "এগুলো কী সত্যি কথা?"

"আরে ধেৎ!" মিসেস হেনরিকসন হাসলেন, "স্টেট যদি এতো কাজের হতো তাহলে তো দেশের চেহারাই পাল্টে যেতো!"

টুম্পা বলল, "তুমি আমার বাবাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছ!"

মিসেস হেনরিকসন বললেন, "আসলে আমি এমন কিছু ভয় দেখাই নি, তোমার বাবা মানুষটাই ভীতু!"

মিসেস হেনরিকসন ছোট রাস্তা থেকে একটু বড় রাস্তায় উঠে বললেন, "টুম্পা তোমাকে একটা জিনিস বলে রাখি আমি যে অনেক হৈ চৈ করে তোমাকে এই কম্পিটিশনে নিয়ে যাচ্ছি সেটা থেকে তোমার যেন কোনো ভুল ধারণা না হয়।"

"কী ভুল ধারণা?"

ছবি আঁকা হচ্ছে একটা ক্রিয়েটিভ কাজ, গল্প কবিতা লেখাও হচ্ছে ক্রিয়েটিভ কাজ। ক্রিয়েটিভ কাজের মাঝে কোনো কম্পিটিশন হয় না! কম্পিটিশন ব্যাপারটাই হচ্ছে এক ধরনের ছেলেমানুষী। আমি কম্পিটিশন পছন্দ করি না, কারণ কম্পিটিশনে একজন আরেকজনকে হারাতে চেষ্টা করে। আসলে একজন কখনোই আরেকজনকে হারাতে চেষ্টা করবে না, সব সময় আরেকজনকে জিতিয়ে দেবার চেষ্টা করবে, তাহলে সবাই জিতবে। আমি তোমাকে কিন্তু কম্পিটিশনে জেতার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি না।"

"তাহলে কীসের জন্যে নিয়ে যাচ্ছ?"

"আমি তোমাকে কম্পিটিশনে অংশ নেবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। এখানে অংশ নিলেই তুমি ঠিক তোমার মতো আরো অনেক শিল্পীদের দেখা পাবে। তাদের সাথে সময় কাটাতে পারবে, কথা বলতে পারবে। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"যদি কম্পিটিশনে জেতার চেষ্টা করো আর যদি না জেতো তা হলে মন খারাপ হবে। আর যদি শুধু অংশ নাও জেতার চেষ্টা না করো তাহলে আনন্দ পাবে। বুঝেছ?"

টুম্পা আবার মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

বড় রাস্তাটা ফ্রিওয়েতে উঠে যাচ্ছিল, মিসেস হেনরিকসন ফ্রিওয়েতে না উঠে তার পাশের বিশাল পার্কিং লটে ঢুকে গেলেন।

টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "এখানে ঢুকছ কেন?"

"অন্যেরা যারা যাবে তারা সবাই এখানে আসবে।"

"আর কারা যাবে?"

"তোমাদের ক্লাশের ছেলেমেয়েরা। আমি যখন বুঝতে পেরেছি তোমাকে তোমার বাবা মা বাসা থেকে বের হতে দেয় না তখন আমার মনে হয়েছে টিপিক্যাল আমেরিকান টিনএজাররা কীভাবে স্ফূর্তি করে তোমার সেটা দেখা দরকার।" মিসেস হেনরিকসন চোখ মটকে বললেন, "তুমি কী ভেবেছ শুধু তুমি আর আমি যাব বলে এতো বড় ভ্যান নিয়ে রওনা দিয়েছি?"

কথা বলতে বলতে মিসেস হেনরিকসন তার ভ্যানটা একটা ছোট ঘরের সামনে দাঁড় করালেন এবং টুম্পা অবাক হয়ে দেখলো তার ক্লাশের অনেক ছেলে মেয়ে হৈ হৈ করতে এগিয়ে এল। মিসেস হেনরিকসন টুম্পার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "এতোগুলো টিন এজারকে আমি একা নিয়ে যেতে সাহস করি নি, তাই আমার সাথে জেসিকার মাও যাচ্ছেন! জেসিকার মা মিসেস রবার্টসন আমার পাশে বসবেন—তুমি যাও, পিছনে তোমার বন্ধুদের সাথে বস!"

টুম্পা দরজা খুলে বের হয়ে এল এবং সব ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে চেঁচামেচি করতে লাগলো। জেসিকার মা মিসেস রবার্টসন বললেন, "আমরা যাচ্ছি একটা কম্পিটিশনে, তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা যাচ্ছ ফুটবল খেলতে!"

মাইকেল দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমরা তো আগে কখনো আর্ট কম্পিটিশনে যাই নাই তাই ফুটবল খেলার মতো করেই আর্ট কম্পিটিশন করে ফেলব।"

জেসিকা বলল, "টুম্পা যখন ছবি আঁকবে আমরা তখন চারপাশে ঘিরে লাফাব আর চিৎকার করব, সাবাশ টুম্পা সাবাশ!"

জেসিকার কথা শুনে সবাই হি হি করে হাসতে থাকে!

আটলান্টিক সিটিতে পৌছাতে তিন ঘন্টার মতো সময় লেগে গেল। মাঝখানে কিছু একটা খাওয়ার জন্যে খানিকক্ষণের জন্যে থামা হয়েছিল কিন্তু এতোগুলো টিনএজারকে নামানোর পর আবার সবাইকে একত্র করে ভ্যানে তুলতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল, তা না হলে আরো কিছুক্ষণ আগে পৌছানো যেতো। আটলান্টিক সিটিতে যাবার সময় টুম্পা অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো এই বয়সের ছেলেমেয়েরা যখন একসাথে থাকে তখন কোনো কারণ ছাড়াই

তাদের লাগাম ছাড়া আনন্দ হতে থাকে। তারা যেটাই করে সেটাকেই মনে হয় মজার, সেটা নিয়েই তারা হাসাহাসি করে গড়াগড়ি খেতে থাকে। প্রথম প্রথম টুম্পার একটু জড়তা হচ্ছিল কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই সে তাদের সবার একজন হয়ে গেল।

আটলান্টিক সিটি পৌঁছে কনভেনশন সেন্টারটা খুঁজে বের করে ভ্যানটাকে পার্ক করে সবাই ছুটতে ছুটতে যখন কনভেনশন সেন্টারের গেটে এসে পৌঁচেছে তখন কম্পিটিশন প্রায় শুরু হয়ে গেছে। গেটে সবাই আবিষ্কার করল টুম্পা ছাড়া আর কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবে না। ছবি আঁকার জন্যে সময় দেয়া হবে তিনঘণ্টা, তারপর সবাই ভেতরে ঢুকতে পারে। ছবিগুলো তখন টানিয়ে দেওয়া হবে বিচারকেরা ঘণ্টা দুয়েক সময় নেবেন, তারপর ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

ভেতরে টুম্পা ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারবে না শুনে প্রথমে সবাই একটু চেঁচামেচি করল, মিসেস হেনরিকসন তখন তাদের শান্ত করলেন, কাছেই আটলান্টিক মহাসমুদ্র, তার বেলাভূমিতে গিয়ে সবাই সময় কাটাতে পারবে। বয়স কম বলে কেউ ক্যাসিনোতে ঢুকতে পারবে না, কিন্তু ক্যাসিনোর পাশেই আছে বিশাল বোর্ড ওয়াক সেখানে সবার জন্যে হাজারো রকমের স্ফূর্তির ব্যবস্থা আছে। তখন সবাই টুম্পাকে বিদায় জানিয়ে ছবি আঁকার জন্যে ভেতরে পাঠিয়ে দিল।

টুম্পা তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে খুঁজে খুঁজে তার জায়গাটা বের করলো, সবাই এর মাঝে চলে এসেছে। চারিদিকে নানাবয়সী ছেলেমেয়ে বোর্ডে কাগজ লাগিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে। সামনে একটা পোডিয়াম সেখানে শুকনো চেহারার একজন বয়স্কা মহিলা মাইক্রোফোনে প্রতিযোগিতার নিয়ম কানুনগুলো বলে দিলেন। কমবয়সী একটা মেয়ে বড় পিতলের একটা ঘন্টা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেটাতে কাঠের একটা হাতুড়ি দিয়ে ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিতেই কনভেনশন সেন্টারের ছেলেমেয়েরা হাতে পেন্সিল তুলে নিয়ে স্কেচ করতে শুরু করে।

টুম্পা তার ডানে এবং বামে তাকালো, প্রায় তার বয়সী ছেলেমেয়েরা হাঁটু ছাড়িয়ে বসে কোলে বোর্ডটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। সামনে ছবি আঁকার সরঞ্জাম সাজানো। টুম্পা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, মিসেস হেনরিকসন বলে দিয়েছেন তাকে এই প্রতিযোগিতায় জিততে হবে না, তাকে

শুধু অংশ নিতে হবে। সে জেতার চেষ্টা করবে না, শুধু সুন্দর করে মমতা দিয়ে একটা ছবি আঁকবে। কী আঁকবে সে?

যশোর রোড! হ্যাঁ তার মাথায় এখনো মৌসুমী ভৌমিকের গাওয়া সেই গানটি গুনগুন করছে, সে সেই যশোর রোডেরই একটা ছবি আঁকবে। একটা মা তার শিশু সন্তানকে বুকে জড়িয়ে যশোর রোডে দাঁড়িয়ে আছে, শিশুটির মুখে ভয় এবং বিস্ময়, মায়ের চোখে মুখে একই সঙ্গে দুঃখ বেদনা হতাশা আর ক্রোধ। পিছনে আরো অসংখ্য মানুষ, বহু দূরে দেখা যাচ্ছে আগুনের লকলকে শিখা।

টুম্পা বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে বোর্ডের উপর ঝুঁকে পড়ে।

ঠিক কীভাবে তিন ঘণ্টা পার হয়েছে টুম্পা বলতে পারে না। যখন একজন এসে নরম গলায় বলল, "মেয়ে, তোমার সময় শেষ" তখন যেন সে চেতনা ফিরে পেলো! ছবিটি এখনো শেষ হয় নি—আহা, সে যদি আরো কিছুক্ষণ সময় পেতো!

টুম্পা যখন ছবি আঁকার সরঞ্জামগুলো তার ব্যাগের ভেতর ঢোকাচ্ছে তখন সে তাদের দলটিকে আবিষ্কার করলো। কয়েকজনের মাথায় বিচিত্র টুপি, মুখে রঙ মাখানো, কারো গলায় বিচিত্র মালা কিংবা হাতে কটকটে লালরঙের খেলনা। সবাই টুম্পার দিকে ছুটে এল, তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করল, "কেমন হয়েছে? কেমন হয়েছে তোমার ছবি?"

টুম্পা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "শেষ করতে পারি নি।"

জেসিকা চোখ কপালে তুলে বলল, "তিন ঘণ্টাতেও শেষ করতে পার নি! কী আঁকছিলে তুমি? পিকাসোর গুয়েনির্কা?"

টুম্পা হেসে ফেলল, বলল, "না। গুয়েনির্কা না! এমনিই একটা ছবি, আসলে সময়ের দিকে খেয়াল ছিল না।"

জিম জানতে চাইলো, "কেমন হয়েছে?"

"যেটুকু শেষ হয়েছে সেটুকু খারাপ হয় নাই।"

মাইকেল জিজ্ঞেস করল, "প্রাইজ পাবে?"

টুম্পা মাথা নেড়ে বলল, "মিসেস হেনরিকসন বলেছেন প্রাইজের জন্যে কখনো ছবি আঁকতে হয় না।"

ড্যানিয়েল গলা নামিয়ে বলল, "মাঝে মাঝে আঁকলে দোষ হবে না। ফার্স্ট প্রাইজ দুই হাজার ডলার!"

মাইকেল বলল, "দু-ই-হা-জা-র! সর্বনাশ! এতো টাকা দিয়ে কী করবে?"

টুম্পা বলল, " যে সে টাকাটা পাবে, তাকে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে দাও। আমার এখন খুব খিদে পেয়েছে। কিছু একটা খাব চল।"

তখন সবাই একসাথে হৈ হৈ করে উঠল, বলল, "চল যাই। চল। আমাদেরও খুব খিদে পেয়েছে। কাছেই একটা ম্যাকডোনাল্ড আছে।"

খেয়ে দেয়ে তারা যখন ফিরে এসেছে তখন সব ছবিগুলো কনভেনশন সেন্টারের দেয়ালে টানিয়ে দেয়া হয়েছে, সবাই ঘুরে ঘুরে সেই ছবিগুলো দেখছে। বিচারকদের হাতে কাগজ নাকের ডগায় চশমা, তারা খুটিয়ে খুটিয়ে ছবিগুলো দেখছেন। তারা নিশ্চয়ই ছবির মাঝে অন্য কিছু একটা খোঁজেন কারণ খুব সুন্দর করে আঁকা একটা ছবি পাশ কাটিয়ে সাদামাটা একটা ছবির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিড় বিড় করে নিজেদের মাঝে কথা বলেন। সবাই মিলে টুম্পার ছবিটা খুঁজে বের করল, জেসিকা চোখ বড় বড় করে বলল, "বাহ্! কী চমৎকার।"

জিম জিজ্ঞেস করল, "তুমি যে বললে শেষ করো নি?" কোথায়?" এটা তো শেষ হয়েছে!"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "না শেষ হয় নাই।"

"কোন জায়গাটা শেষ হয় নাই?"

টুম্পা বলল, "তুমি যদি দেখে বুঝতে না পার তাহলে আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না!"

জিম ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে অন্য ছবিগুলো দেখতে চলে গেল।

ঠিক সময়মতো অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব শুরু হয়েছে। আয়োজকদের একজন প্রথমে সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর স্থানীয় একজন মহিলা শিল্পীকে একটা পদক দেওয়া হলো। পদকটি নিয়ে সেই মহিলা শিল্পী ভদ্রতার দুই একটি কথা বললেন, তারপরই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়ে গেল। এ ক্যাটাগরিতে প্রথম হলো একটি কালো ছেলে, সে যখন পুরস্কার নিতে গেল তখন তাকে দেখে কারো সন্দেহ থাকে না যে সে বড় হয়ে একজন সত্যিকারের শিল্পী হবে—মাথায় এলোমেলো চুল, ঢিলেঢালা বিবর্ণ টি সার্ট, ঢুলু ঢুলু চোখ! দ্বিতীয় হলো সোনালি চুলের ফুটফুটে একটি মেয়ে। তৃতীয় হলো দুজন, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে, পুরস্কারটা কীভাবে দুজন ভাগ করে নেবে সেটা ঠিক করতে আয়োজকদের খানিকক্ষণ মাথা ঘামাতে হলো।

বি ক্যাটাগরির পুরস্কার ঘোষণার ঠিক আগে আগে টুম্পার বুকটা ধুকপুক করতে লাগলো। সে জানে এখানে যারা আজ ছবি আঁকতে এসেছে তারা সবাই খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। কম্পিটিশন শেষ হবার পর টুম্পা ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখেছে, অনেকেই একেবারে অসাধারণ। মিসেস হেনরিকসন বলেছেন ছবি আঁকা হচ্ছে একটা সৃজনশীল কাজ, সৃজনশীল কাজে কোনো কম্পিটিশন হয় না। টুম্পা নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল, আজকেও কোনো কম্পিটিশন নেই, পুরস্কার পাওয়া বা না পাওয়াতে কিছু আসে যায় না। সবাই মিলে আনন্দ করেরেছে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। এতো সব কিছু জানার পরেও টুম্পার বুক ধুকপুক করতে লাগলো।

প্রথম পুরস্কারের নাম ঘোষণা করা হলো। একজন হিস্পানিক ছেলে, সে আনন্দে চিৎকার করতে করতে স্টেজে ছুটে যায়। মেডেলটা গলায় ঝুলিয়ে সে দুই হাজার ডলারের চেক ভরা খামটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে স্টেজে নাচতে থাকে। তার আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গীটা এতো আন্তরিক যে সবাই হাসতে হাসতে হাত তালি দিতে থাকে। এবারে দ্বিতীয় পুরস্কারের নাম ঘোষণা করা হবে। টুম্পার কাছে মনে হয় সবকিছু কেমন যেন থেমে গেছে। মানুষটি যেন খুব ধীরে ধীরে মাইক্রোফোনের সামনে এল, তার বাইরে ধীরে ধীরে হাতের কাগজটা খুলে নামটি দেখলো তারপর মাইক্রোফোনের সামনে মুখ এগিয়ে নিলো নামটি উচ্চারণ করার জন্যে। টুম্পার মনে হলো নামটি উচ্চারণ করতে গিয়ে মানুষটি যেন থেমে গিয়েছে, স্থির হয়ে গেছে অনন্তকালের মতো!

'টুম্পা রায়হান!" হঠাৎ করে টুম্পা তার নিজের নামটা শুনতে পায়, কয়েকমুহূর্ত লাগলো তার বুঝতে যে সত্যিই দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে গেছে। কোনোমতে সে উঠে দাঁড়ালো, তার চারপাশে যারা বসে আছে তারা লাফিয়ে চিৎকার করে কনভেনশন হলের ছাদ পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে!

টুম্পা হেঁটে হেঁটে স্টেজে গেল, বয়স্ক একজন মানুষ তার গলায় মেডেল পরিয়ে দিলেন, দেড় হাজার ডলারের একটা চেক ধরিয়ে দিলেন আরেকজন। টুম্পা স্টেজ থেকে নিচে নেমে আসছিল, তখন কাগজপত্র হাতে একজন টুম্পার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসলো, বলল, "অসাধারণ ছবি! শেষ করার সময় পেলে না, আফসোস!"

টুম্পা কী বলবে বুঝতে না পেরে একটু হাসার চেষ্টা করলো। মানুষটি আবার বলল, "ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হয়ে যেয়ো না যেন!"

টুম্পা বলল, "হব না!"

মানুষটি হঠাৎ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "ছবিটার নাম দিয়েছ যশোর রোড। যশোর রোড মানে কী?"

'উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের দেশে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল তখন যশোর রোড দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে গিয়েছিল। খুব সুন্দর একটা কবিতা আছে এর উপরে। এলেন গিনসবার্গের লেখা!"

"তাই নাকি! এলেন গিনসবার্গ আমারও খুব প্রিয় কবি।"

মানুষটি কাগজগুলো নিয়ে সরে যায়, টুম্পা তখন নিচে নিমে এল।

ক্লাশের সবাই তাকে ধরে জাপটাজাপটি করছে। জিম খামটা খুলে দেড় হাজার ডলারের চেকটা বের করে এনেছে! ড্যানিয়েল জিজ্ঞেস করল, "ঠোম্পা! তুমি কী করবে দেড় হাজার ডলার দিয়ে?"

"বাংলাদেশে যাবার জন্য প্লেনের টিকেট কিনব!"

কথাটা বলার আগের মুহূর্তেও টুম্পা জানতো না সে এই কথাটা বলবে। বলে ফেলার পর সে বুঝতে পারলো, অবশ্যই সে এই কথাটিই বলবে! তা না হলে কী বলবে সে?

সবুজ দেশ

প্লেনের জানালাটা উপরে তুলে টুম্পা বাইরে তাকায়। চারিদিক অন্ধকার তার মাঝে বহুদূরে বিস্তৃত একটা পর্বতমালা সোনালি আলোতে চকচক করছে। প্লেনটা এখন নেপালের পাশ দিয়ে যাচ্ছে—কাজেই এটা নিশ্চয়ই হিমালয় পর্বতমালা। এর মাঝে কোনো একটা নিশ্চয়ই এভারেস্ট, টুম্পা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বতমালাকে সে দেখছে, নিজের চোখে না দেখলে সে কী জানতো ভোর রাতে সূর্যের প্রথম আলোতে হিমালয় পর্বতের রঙ হয় কাঁচা সোনার মতো?

টুম্পা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে সে সত্যি সত্যি বাংলাদেশে যাচ্ছে। একা। তাকে যেতে দেবেই না এবং সে যাবেই—এই নিয়ে গত কয়েকটা সপ্তাহ যে কীভাবে কেটেছে সেটা শুধু টুম্পাই বলতে পারবে। সে যখন প্রথমবার বলেছিল একদিন সে বাংলাদেশে বেড়াতে যাবে সেটা ছিল একটা কথার কথা। কথাটা সে খুব জোর দিয়ে বলে নি, বিষয়টা ছিল অনেকটা ভবিষ্যৎ কল্পনার মতো। তার নতুন বাবা যখন তার সেই কল্পনাটাকে নিয়ে টিটকারি দিতে শুরু করলেন তখন সেই কল্পনাটা আস্তে আস্তে কীভাবে জানি সত্যিকারের একটা প্রতিজ্ঞা হয়ে গেল। কীভাবে যাবে সে জানতো না, তার বাবা কোনো দিনই তার পিছনে এতোগুলো টাকা খরচ করবে না কিন্তু তারপরেও টুম্পা জানতো সে একদিন বাংলাদেশে যাবেই যাবে। আটলান্টিক সিটিতে আর্ট কম্পিটিশনে দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে দেড় হাজার ডলার পেয়ে যাবার পর হঠাৎ করে টুম্পা আবিষ্কার করলো তার বহুদূরের একটা কল্পনা সত্যি হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আর পুরো ঝামেলাটাই শুরু হয়েছে তখন।

নতুন বাবার সাথে টুম্পার কখনোই একটা আন্তরিক সম্পর্ক হয় নি। যখন তার মায়ের সাথে বিয়ে হয় সে ছিল অনেক ছোট, পুরো ব্যাপারটা ছিল এক ধরনের বিভীষিকার মতো। সে ধরেই নিয়েছিল যে মানুষটি আম্মুকে তার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলেছে সেই মানুষটি ভালো মানুষ না। তার নতুন বাবা কোনোদিন সেই ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করেন নি। যত দিন গিয়েছে টুম্পা টের পেয়েছে তার নতুন বাবা আসলে তার সত্যিকার বাবা না, তার আম্মুকে বিয়ে করা একজন মানুষ! তার নতুন বাবা কোনোদিন তাকে সত্যিকার অর্থে আদর করেন নি, বড়জোর তাকে সহ্য করেছেন। বড় একজন মানুষ হয়েও ছোট একটি মেয়েকে তাচ্ছিল্য করেছেন। টুম্পার অনেক ছোটখাটো সখকে গলা টিপে মেরেছেন। বাংলাদেশে যাওয়া নিয়ে তার সখটুকুকে টুম্পা প্রথমবার মরে যেতে দেয় নি। সেটার জন্যে রীতিমতো যুদ্ধ করেছে। বাবা কথাবার্তায় অনেকবার বলেছেন বাংলাদেশটা কতো ভয়ংকর সেটা টুম্পাকে বোঝানোর জন্যে তাকে একদিন বাংলাদেশ পাঠাবেন, কিন্তু যখন টুম্পা নিজেই বাংলাদেশ যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো বাবা পুরোপুরি বেঁকে বসলেন। ঠিক কারণটা কী বাবাও পরিষ্কার করে বলেন না টুম্পাও বুঝতে পারে না। কীভাবে কী হলো কে জানে টুম্পাও গোঁ ধরে বসল সে বাংলাদেশে বেড়াতে যাবেই! দুজনের মাঝে রীতিমতো যুদ্ধ, অনেকটা কে হারে কে জেতে অবস্থা!

শেষ পর্যন্ত কী হতো কে জানে কিন্তু আম্মু বিষয়টাকে সামলে নিয়েছেন। দেশে ছোট বোনের সাথে কথা বলে বাংলাদেশে টুম্পার থাকার ব্যবস্থা করেছেন এবং বাবাকে অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছেন। টুম্পা তার নিজের টাকা দিয়ে প্লেনের টিকেট কিনেছে। বাংলাদেশ কনসুলেট থেকে পাশপোর্টে "ভিসার প্রয়োজন নেই" সিল বসিয়েছে। দেশে তার ছোট খালা আর খালাতো ভাইবোনের জন্যে উপহার কিনেছে। ছবি তোলার জন্যে ডিজিটাল ক্যামেরা কিনেছে তারপর একদিন জে.এফ.কে এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে চেপে বসেছে। এখন গ্রীষ্মকালীন ছুটি, টুম্পা যাচ্ছে মাত্র চার সপ্তাহের জন্যে কিন্তু তারপরেও প্লেনে ওঠার সময় আম্মুর চোখ ছল ছল করতে লাগলো।

টুম্পা প্লেনের সিটে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললো। বাংলাদেশে তার এই ভ্রমণটা আসলে শুধু ভ্রমণ না, এটা একদিক দিয়ে একটা চ্যালেঞ্জ অন্যদিক দিয়ে একটা তীর্থযাত্রায় যাবার মতো!

সে এখান থেকে ঘুরে গিয়ে বলতে চায় যেখানে আমার জন্ম হয়েছিল আমি সেই জায়গাটা দেখে এসেছি। আমি সেই মাটিতে পা রেখেছি, সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছি সেই পানিতে শরীর ভিজিয়েছি। কেন সে এটা করতে চায় সে জানে না। সেটা নিয়ে টুম্পা মাথাও ঘামায় না, সবকিছুরই যে একটা ব্যাখ্যা থাকবে সেটা কে বলেছে? টুম্পা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে, খুব ধীরে ধীরে বাইরে আলো হয়ে আসছে। সে সেখান থেকে আসছে সেখানে দিন শেষ হয়ে এখন অন্ধকার নেমে আসছে আর এখানে ঠিক তার উল্টো বিষয়টা চিন্তা করেই টুম্পার কেমন জানি অবাক লাগতে থাকে! জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ছাড়াছাড়া একধরনের ঘুমে টুম্পার দুই চোখ বন্ধ হয়ে আসে।

টুম্পার যখন ঘুম ভাঙলো তখন বিশাল প্লেনটা নিচে নামার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। টুম্পা জানালা দিয়ে নিচে তাকায়, যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। বিশাল নদী তার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। প্লেনটা ধীরে ধীরে নিচে নামছে একটু পর পর কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে চারিদিক, পরের মুহূর্তে আবার সব মেঘ কেটে ঝকঝকে নীল আকাশ। টুম্পা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। এটিই সেই দেশ? যে দেশে তার জন্ম হয়েছিল?

প্লেনটা শেষ পর্যন্ত রানওয়েতে ল্যান্ড করলো তারপর ধীরে ধীরে ট্যাক্সি করে টার্মিনালের দিকে এগুতে থাকে। টুম্পা মনে মনে অনুমান করেছিল দেখবে ছোট একটা এয়ারপোর্ট, কিন্তু আসলে বেশ বড়। অনেকগুলো ছোট বড় প্লেন সারি বেধে দাঁড়িয়ে আছে।

প্লেনটা থামার সাথে সাথে যাত্রীদের সবার মাঝেই বেশ একটা হুটোপুটি লেগে গেল, সবাই নিজের ব্যাগ নামিয়ে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর কিছুক্ষণের মাঝেই সবাই প্লেন থেকে নামতে শুরু করে। প্লেন থেকে নামার সাথে সাথে তাকে গরমের একটা হলকা এসে আঘাত করে। এটাই তাহলে বাংলাদেশের গরম? সবাই ব্যস্ত ভঙ্গীতে হাঁটছে তাদের পিছু পিছু বেশ খানিকটা জায়গা এসে টুম্পা একটা বড় হলঘরের মতো জায়গায় হাজির হলো, সেখানে অনেক মানুষ তারা ইমিগ্রেশনের ভেতর দিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। টুম্পা অবাক হয়ে গেল—এতো সকালে এততো মানুষ কোথা থেকে এসেছে?

টুম্পার আমেরিকান পাসপোর্ট, তাই সে বিদেশীদের জন্যে আলাদা লাইনটিতে দাঁড়িয়েছে। এই লাইনের মানুষগুলোর শুধু পাসপোর্টগুলোই বিদেশী, মানুষগুলোর বেশিরভাগই এই দেশেরই। টুম্পা ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং খুব ধীরে ধীরে লাইনটা এগুতে থাকে। তার পাশে অনেকগুলো লাইন বাংলাদেশের মানুষের জন্যে, সেগুলোতে খুব ঝামেলা হচ্ছে, লাইনগুলো মোটেই এগুচ্ছে না এবং যারা দাঁড়িয়ে আছে আস্তে আস্তে তাদের মেজাজ গরম হয়ে উঠছে! টুম্পা কারণটা কিছুক্ষণের মাঝেই বুঝে গেল, যে পুলিশগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে তারাই ঝামেলা করছে। ভালো পোশাক পরা মানুষগুলোকে লাইন ভেঙে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। মিলিটারির অনেকগুলো মানুষ এসে লাইন ভেঙে সবার আগে চলে গেল, টুম্পা বাজী ধরে বলতে পারে এই মানুষগুলোকে সারাজীবন শুধু নিয়ম মেনে চলার কথা শেখানো হয়েছে, অন্য কেউ নিয়ম ভাঙলে তারা নিশ্চয়ই রেগে আগুন হয়ে যায় অথচ এখন তারাই কী সুন্দর নিয়ম ভেঙে সবার সামনে দিয়ে দাঁড়াচ্ছে! টুম্পা পাশের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

মানুষটি বলল, "এ্যাঁ?"

টুম্পা বুঝতে পারল সে প্রশ্নটা করে ফেলেছে ইংরেজিতে। এই মানুষটা একেবারে সাধারণ চেহারার মানুষ, নিশ্চয়ই ইংরেজি জানে না। তাই এবার বাংলাতে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

মানুষটা বলল, "দুবাই।"

"ও!" এখন হঠাৎ করে টুম্পা বুঝতে পারলো এতো সকালে এয়ারপোর্টে কেন এত ভীড়। ইন্টারনেট থেকে সে জেনেছে বাংলাদেশের অনেক মানুষ মিডলইস্টে কাজ করতে যায়, সেরকম মানুষদের নিয়ে নিশ্চয়ই একটা প্লেন এসেছে। এই মানুষগুলো নিশ্চয়ই সেই প্রবাসী শ্রমিক। টুম্পা আবার কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ কোথা থেকে একটা পুলিশ এসে এই মানুষগুলোকে যাচ্ছেতাই ভাবে গালাগাল করতে লাগলো, টুম্পা এতো অবাক হলো বলার নয়, বাংলাদেশের পুলিশরা এরকম কেন? আমেরিকাতে পুলিশেরা তো খুব ভদ্র ব্যবহার করে। টুম্পা খানিকক্ষণ চেষ্টা করলো বোঝার জন্যে পুলিশটা কেন মিডল ইস্ট থেকে ফিরে আসা শ্রমিকের সাথে কেন এতো

খারাপ ব্যবহার করছে। বুঝতে না পেরে পুলিশটাকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এই প্যাসেঞ্জারের সাথে এরকম ব্যবহার করছেন কেন?"

"আর বলবেন না।" পুলিশটা মুখ খিঁচিয়ে বলে, "এই যন্ত্রনারা মিডল ইস্টে গিয়ে ঘর ঝাড়ু দেয়, আর দেশে এসে ভাব করে যেন একেকজন একটা লাট সাহেব!"

টুম্পা খুব অবাক হলো তার কথা শুনে, বলল, "আপনি জানেন এরা বাংলাদেশের জন্যে কতো ফরেন কারেন্সি আনেন?"

পুলিশটা একটু থতমত খেয়ে হাত নেড়ে বিষয়টা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গী করল, সেটা দেখে টুম্পার মেজাজ আরো গরম হয়ে গেল। সে গলা উঁচিয়ে বলল, "এরা বাংলাদেশে রেমিটেন্স পাঠান আট বিলিয়ন ডলার। আট। এক বিলিয়ন ডলার কতো টাকা জানেন? সাত হাজার কোটি টাকা। বুঝেছেন?"

পুলিশটা কী বুঝেছে কে জানে, সে একবার চোখ পিট পিট করে তাকালো। টুম্পা বলল, "আপনার এই সুন্দর পোশাক, এই এয়ারপোর্ট, আপনার বেতন সবকিছু এই মানুষগুলো উপার্জন করে আনে, আর আপনারা তাদের সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করেন? ছিঃ!"

টুম্পা মনে হয় গলা একটু উচিয়ে কথা বলে ফেলেছিল, কারণ দেখা গেল রেগে খাপ্পা হয়ে থাকা শ্রমিকেরা অনেকেই কান পেতে টুম্পার কথাটা শুনলো তারপর সবাই একটা গর্জন করে উঠলো, কেউ একজন বলল, "ধর শালা পুলিশকে! কতো বড় সাহস আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে?"

সাথে সাথে পুরো এয়ারপোর্টে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল, টুম্পা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, দেখে কেউ একজন খপ করে পুলিশটার কলার ধরে ফেললো এবং তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। হৈ চৈ চেঁচামেচি গোলমাল, আরো অনেক পুলিশ কোথা থেকে হাজির হয় পুলিশের বাঁশি বাজতে থাকে, মানুষজনের চিৎকার দাপাদাপি হুটোপুটিতে পুরো এলাকাটা সরগরম হয়ে যায়।

টুম্পার সামনে একজন বিদেশিনী দাঁড়িয়ে পুরোটা অবাক হয়ে দেখছিল, সে ঘুরে টুম্পার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কী বলে এই সবমানুষগুলোকে এভাবে খেপিয়ে দিলে?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি এমন কিছু বলি নাই! মানুষগুলো মনে হয় খেপেই ছিল।"

খেপে ওঠার কারণে অবশ্যি একটু লাভ হলো। আরো কয়েকটা কাউন্টার খুলে তাড়াতাড়ি সবাইকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো।

টুম্পা ইমিগ্রেশন থেকে বের হয়ে কনভেয়ার বেল্টের উপর থেকে খুঁজে তার স্যুটকেস দুটো বের করে একটা কার্টের উপর তুলে ঠেলে ঠেলে বের হতে থাকে। কাচের দেয়ালের অন্যপাশে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ভেতর কেউ একজন নিশ্চয়ই তার ছোট খালা, কিন্তু সে তাদের কাউকে চেনে না! প্রথমে বের হওয়া যাক, তারপর খুঁজে বের করবে।

কাস্টমসের মানুষগুলো উদাসভাবে বসে ছিল, টুম্পাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করলো না এবং টুম্পা তার স্যুটকেস নিয়ে বের হয়ে এল। বাইরে এসে সে যখন এদিক সেদিক তাকাচ্ছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে টকটকে ফর্সা মোটা সোটা একজন মহিলা এবং তার পিছু প্রায় টুম্পার বয়সী দুজন ছেলেমেয়ে তার দিকে ছুটে এল। মোটাসোটা মহিলাটি বললেন, "টুম্পা?" টুম্পা কোনো উত্তর দেবার আগেই মহিলাটি তাকে জাপটে ধরে ফেলে তার চোখেমুখে এবং ঘাড়ে চুমু খেতে শুরু করলেন। টুম্পা শুনলো চুমু খাবার ফাঁকে ফাঁকে বলছেন, "ও মা! তুই কতো বড় হয়েছিস! কতো বড় আর কত সুন্দর! তোকে আর আমি যেতে দেব না। একটা সুন্দর দেখে জামাই খুঁজে বের করে তোর বিয়ে দিয়ে দেব। ঘরজামাই করে দেব—"

টুম্পার বয়সী মেয়েটা বিব্রত হয়ে বলল, "আম্মু, কী করছ তুমি? কী করছ?"

মহিলাটি নিশ্চয়ই ছোট খালা হবেন, মেয়েটির কথাকে এতোটুকু পাত্তা দিলেন না, টুম্পাকে আরো জোরে জাপটে ধরে বললেন, "তুই একেবারে এতটুকুন ছিলি। জন্মের পর আমি সবার আগে তোকে কোলে নিয়েছি, কথা নেই বার্তা নেই তুই ঝির ঝির করে পেশাব করে দিলি—"

এবার মেয়েটি আসলেই খুব বিরক্ত হলো, মাকে টেনে সরানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "আম্মু তুমি এখন থামবে?"

ছোট খালা থামার কোনো লক্ষণ দেখালেন না, টুম্পার চোখে মুখে মাথায় চুমু খেতে খেতে বললেন, "কতোদিন তোরে দেখি না! আহারে! এই খালার কথা তোর একবারও মনে পড়ে নাই?"

দুই ভাই বোন মিলে এবারে তার মা আর টুম্পাকে টেনে আলাদা করে বলল, ছেলেটা বলল, "টুম্পা আপু তুমি কিছু মনে করো না! তুমি বাংলাদেশে আসছ খবর পাবার পর থেকে আম্মুর মোটামুটি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!"

মেয়েটা বলল, "আমাদের কথা সব ভুলে গেছে! এখন খালি তোমার কথা বলে আর কিছু বলে না!"

ছেলেটা বলল, "ও! আচ্ছা, আপু তুমি বাংলা বুঝো তো?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝি।"

"গুড।" ছেলেটা বলল, "আমার নাম রুমি। আমি তোমার কাজিন। খালাতো ভাই।"

মেয়েটা বলল, "আমি সুমি। তোমার খালাতো বোন।"

ছেলেটা বলল, "আর এই যে মহিলাটা তোমাকে চেপে ধরে চুমু খাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের আম্মু। তোমার খালা।"

টুম্পা বলল, "আমি সেটা আন্দাজ করেছি।"

টুম্পার ছোট খালা আবার টুম্পাকে চেপে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। রুমি আর সুমি অনেক কষ্ট করে তার মাকে টেনে আলাদা করল। ঠিক কী কারণ জানা নেই টুম্পার মনে হলো বাংলাদেশের মাটিতে ঠিক এভাবেই কোনো একজনের এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার কথা ছিল, ঠিক এইভাবে তার ঘাড়ে আর মাথায় চুমু খাবার কথা ছিল!

শেষ পর্যন্ত গাড়িতে উঠে তারা যখন রওনা দিয়েছে তখন ছোট খালা একটানা কথা বলে যেতে লাগলেন, "ঐ দেখ এয়ারপোর্টে আরবিতে নাম লিখে রেখেছে, আরবিতে কেন নাম লিখতে হবে? যারা আরব দেশে থাকে এটা কী তোদের দেশের এয়ারপোর্ট? তারা কী তাদের দেশের এয়ারপোর্টের নাম বাংলাতে নাম লিখাবে? তাহলে আমরা কেন আরবিতে লিখব? সবুজ বেবিট্যাক্সিগুলি দেখেছিস? এগুলির নাম সি.এন.জি.। খবরদার একা কখনো সি.এন.জি.-তে উঠবি না। উঠলেই তোকে ছিনতাই করে ফেলবে। ছিনতাই করে চোখে গুল লাগিয়ে দেবে। গুল কী জানিস? এক রকম মলম। চোখে লাগালে চোখ জ্বলতে থাকবে, চোখ খুলতে পারবি না। আর এই যে সি.এন.জি. দেখেছিস এক মন্ত্রী প্রতি সি.এন.জি.-তে এক লাখ টাকা করে ঘুষ খেয়েছে। এই মোটা এক মন্ত্রী! তোদের আমেরিকাতে কি সি.এন.জি. আছে?

নাই! আমি জানতাম থাকবে না। যত ভেজাল জিনিষ সব আমাদের দেশে! দ্যাখ টুম্পা তাকিয়ে দেখ রাস্তার পাশে খেজুর গাছ লাগিয়েছে। কেন লাগিয়েছে জানিস? মিডল ইস্ট বানানোর জন্যে। বাংলাদেশ কী মিডল ইস্ট? এখানে রাস্তার পাশে খেজুর গাছ লাগাবে কেন? বুঝলি টুম্পা দেশটাকে জঙ্গীরা দখল করার প্ল্যান করছে। কথা নাই বার্তা নাই খালি বোমা। তোদের আমেরিকাতেও জঙ্গী আছে? আছে না? টেলিভিশনে দেখালো এতো বড় বড় দুইটা দালান গুড়া করে দিল। জঙ্গীদের উৎপাত আর ভালো লাগে না। টুম্পা, তোরা কী খাস ওখানে? ভাত খাস তো? আমি ভাত রেধে রেখেছি তার সাথে মুরগি। দেশি মুরগি। ফার্মের মুরগি আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। তোদের ওখানে তো সব ফার্মের মুরগি। তাই না? দেশি মুরগি খেয়ে দেখিস। স্বাদ একেবারে জিবে লেগে থাকবে। তবে যা দাম—খালি মুরগি না সব কিছুর দাম। তুই বিশ্বাস করবি না একবার শুনি কাঁচা মরিচের কেজি চুরাশি টাকা। চুরাশি বুঝিস তো? এইটি ফোর। তুই বিশ্বাস করবি? আমি নিজের চোখে দেখেছি..."

রুমি আর সুমি অনেক কষ্ট করে তার মা'কে থামালো থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "প্লেনে কোনো অসুবিধে হয় নি তো?"

টুম্পা মাথা নাড়লো, "না। হয় নি।"

সুমিই জিজ্ঞেস করলো, "বাংলাদেশ কেমন লাগছে?"

"ভালো। খুব ভালো। শুধু গরম একটু বেশি। আর—"

"আর কী?"

"মানুষ অনেক বেশি।"

রুমি হি হি করে হেসে বলল, "এখানে মানুষ কোথায়। এটা তো ফাঁকা, তোমাকে একদিন নিয়ে যাব বঙ্গবাজারে দেখবে কতো মানুষ!"

সুমি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কয়দিন থাকবে?"

ছোট খালা ধমক দিয়ে বললেন, "মেয়েটা এখনো পৌছায় নাই, এখনই যাবার কথা বলছিস কেন?"

টুম্পা বলল, "না, না, ঠিক আছে। চার সপ্তাহ থাকব।"

"মাত্র চার সপ্তাহ?"

"চার সপ্তাহ মোটেই মাত্র না। আঠাইশ দিন।"

সুমি বলল, "অনেক মজা হবে আমাদের। অনেক মজা।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ অনেক মজা।"

বাসায় পৌঁছানোর পর ড্রাইভার স্যুটকেস দুটি টেনে টেনে উপরে নিয়ে গেল। রুমি সুমির বাবা, টুম্পার ছোট খালু বের হয়ে এলেন, শুকনো পাতলা মানুষ, নাকের নিচে বড় বড় গোঁফ, মাথার চুল সামনের দিকে পাতলা হয়ে এসেছে। টুম্পাকে দেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "এসো মা, এসো। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ!"

টুম্পা বলল, "থ্যাংক ইউ।"

"আমি শুনে খুবই অবাক হয়েছি, তুমি নাকি বাংলাদেশে আসার জন্যে একেবারে টুথ এন্ড নেইল ফাইট করেছ!"

টুম্পা কিছু বলল না, একটু হাসার মতো ভঙ্গি করল। ছোট খালু বললেন, "সবসময়ে তো উল্টোটা দেখি! মানুষ আমেরিকা যাবার জন্যে টুথ এন্ড নেইল ফাইট করে।"

টুম্পা আবার একটু হাসির মতো ভঙ্গী করল। ছোট খালু বললেন, "তুমি এতো সখ করে বাংলাদেশে এসেছ, তোমাকে এখন আমরা কোথায় নিয়ে যাই? এই দেশে তো সেরকম কিছুই নেই। ইন্ডিয়ায় কতো কী দেখার আছে—তাজমহল আছে, অজন্তা ইলোরা আছে, শান্তি নিকেতন আছে—"

টুম্পা বলল, আমি কিছু দেখতে আসি নি ছোট খালু। আমি শুধু বাংলাদেশে আসতে চেয়েছি।"

"সেটা অবশ্যি এসে গেছ, তোমার মিশন কমপ্লিট।"

টুম্পা হাসল, বলল, "মিশন কমপ্লিট।"

রুমি বলল, "না আপু, তুমি মিশন কমপ্লিট বল না। আব্বু আম্মু আমাদের কোথাও নিয়ে যায় না—এখন তোমাকে নিয়ে যেতে হবে—তোমার সাথে সাথে আমরা যাব। কক্সবাজার যাব, রাঙ্গামাটি যাব, সুন্দরবন যাব—"

ছোট খালু বললেন, "টুম্পাকে নিয়ে যাবার কথা, তোদের নিতে হবে কে বলেছে?"

সুমি বলল, "আমাদের না নিয়ে কোথাও যাবার খালি চেষ্টা করে দেখো একবার!"

ছোট খালা বললেন, "ব্যাস অনেক হয়েছে। টুম্পা মা যা, গোসল করে ফ্রেশ হয়ে আয়। তুই সুমির ঘরে থাকবি, তোর স্যুটকেস নিয়ে গেছে তোর ঘরে।"

টুম্পা স্যুটকেস খুলে পরিষ্কার কাপড় বের করে বাথরুমে গেল গোসল করতে। বাথরুম ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছে কিন্তু তার পরেও কেমন জানি একধরনের বিবর্ণ ভাব রয়েছে। তাদের বাথরুমে গোসল করার আলাদা জায়গা থাকে, গোসল করার সময় শুধু সেই জায়গাটা ভিজে বাকিটুকু সবসময় শুকনো থাকে। এখানে সেটা নেই গোসল করলেই পুরো বাথরুম ভিজে থই থই করতে থাকে!

টুম্পা অনেকক্ষণ সময় নিয়ে গোসল করল, এক ধরনের ভ্যাপসা গরম, শাওয়ারের ঠাণ্ডাপানিতে শরীর জুড়িয়ে গেল। কিন্তু বাথরুম থেকে বের হবার পর আবার ভ্যাপসা গরম। কী আশ্চর্য!

টুম্পা তার ঘর থেকে বের হয়ে দেখে ডাইনিং টেবিলের উপর দশ রকম খাবার। টুম্পা চোখ বড় বড় করে বলল, "সর্বনাশ! এতো খাবার কে খাবে?"

ছোট খালা বললেন, "তুই খাবি। বাংলাদেশে এসেছিস বাংলাদেশের খাবার খাবি না?"

"ছোটখালা আমি কিন্তু আমেরিকাতেও বাংলাদেশের খাবার খাই। আম্মু রান্না করে।"

"তোর আম্মুর রান্না! তাহলেই হয়েছে। সে আবার রান্না করতে পারে নাকি?"

রুমি বলল, "টুম্পা আপু, আমাদের আম্মু দুইটা জিনিস খুব ভালো পারে। একটা হচ্ছে রান্না। আরেকটা—"

"আরেকটা কী?"

"সেটা সকালে দেখ নাই? কথা বলা—"

ছোট খালা হাত তুলে বললেন, "চুপ কর বেয়াদপ ছেলে।"

যতক্ষণ প্লেনে ছিল সারাক্ষণই কিছু না কিছু খেয়েছে কিন্তু বেশ অবাক ব্যাপার টুম্পার বেশ খিদে পেয়ে গেছে। সে সবার সাথে বসে খুব সখ করে খেলো। পরটা, কাবাব, সবজি, ডাল, মিষ্টি, পায়েশ, আম দই, কী নেই টেবিলে! ছোট খালা সারাক্ষণই প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছিলেন—কাজেই যেটুকু

খাওয়ার কথা টুম্পা খেলো তার থেকে অনেক বেশি।

খেতে খেতে ছোট খালু বললেন, "তোমাকে প্রথমেই খাওয়া সংক্রান্ত তিনটি গ্রাউন্ড-রুল শিখিয়ে দিই তাহলে কখনোই বিপদে পড়বে না। রুল নাম্বার ওয়ান : কখনোই বাইরে কিছু খাবে না—"

সুমি চোখ বড় বড় করে বলল, "তার মানে নো চটপটি?"

"নো চটপটি। নো ঝালমুড়ি।"

সুমি যন্ত্রণার মতো একটা শব্দ করল যেটা শুনে মনে হতে পারে রাস্তায় চটপটি আর ঝালমুড়ি খাওয়া বাংলাদেশ ভ্রমণের সবচেয়ে বড় অংশ!

ছোটখালু বললেন, "রুল নাম্বার টু : রান্না করা জিনিস ছাড়া আর কিছু খাবে না। তার মানে নো কাঁচা শাকসবজি। নো সালাদ।"

সুমি এবার আনন্দের মতো একটা শব্দ করল। ছোটখালু না শোনার ভান করে বললেন, "রুল নাম্বার থ্রি : সিদ্ধ করা পানি ছাড়া আর কোনো পানি খাবে না। এই তিনটা নিয়ম মেনে চললে মোটামুটি ভাবে তুমি বাংলাদেশে টিকে যাবে।"

রুমি বলল, "ছিনতাই নিয়ে একটা বক্তৃতা দেবে না? হরতাল নিয়ে? সন্ত্রাস নিয়ে?"

ছোট খালা বললেন, "আহা! মেয়েটা মাত্র এসে পৌঁছেছে এর মাঝে যত খারাপ খারাপ কথা সব বলতে শুরু করেছিস! তোরা একটু থামবি?"

রুমি বলল, "ঠিক আছে থামছি। কিন্তু এর পরে টুম্পা আপু যদি বাইরে গিয়ে ছিনতাই হয়ে যায় আমাকে দোষ দিও না!"

খাওয়ার পর টুম্পা তার স্যুটকেস খুলে উপহারগুলো বের করলো। ছোট খালুর জন্যে ইলেকট্রিক রেজর, ছোটখালার জন্যে সোয়েটার আর চামুচের সেট, সুমির জন্যে কানের দুল, রুমির জন্যে একটা বাইনোকুলার! এছাড়া সবার জন্যে চকলেটের প্যাকেট, কফির টিন, শ্যাম্পু, বডি লোশান, বলপয়েন্ট কলম, স্টেপলার খুঁটিনাটি একশো রকম জিনিস! টুম্পা কিছু একটা বের করা মাত্র রুমি সুমি তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে টানাটানি শুরু করে দেয়! সবাই মিলে যখন হৈ চৈ হচ্ছে তখন আমেরিকা থেকে ফোন এল, টুম্পা ঠিকমতো পৌঁছেছে কী না জানার জন্যে আম্মু ফোন করছেন! ছোটখালা টুম্পাকে ফোনটা ধরিয়ে দিলেন, টুম্পাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু বলতে হলো!

কথা শেষ হবার পর ছোট খালা জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আমেরিকাতে কয়টা বাজে?"

"রাত বারোটা!"

"সর্বনাশ, তোর নিশ্চয়ই খুব ঘুম পেয়েছে! তুই শুয়ে একটু বিশ্রাম নে।"

"না, ছোট খালা, আমি প্লেনে অনেক ঘুমিয়েছি।"

"প্লেনে আবার মানুষ ঘুমায় কেমন করে? বিছানায় শুয়ে ঘুমা।"

ছোট খালা রীতিমতো জোর করে টুম্পাকে তার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তখন হঠাৎ করে টুম্পা বুঝতে পারলো আসলেই তার খুব ঘুম পেয়েছে। বিছানায় শুতেই তার চোখ বন্ধ হয়ে এল, তার এখনও বিশ্বাস হয় না, পৃথিবীর একেবারে উল্টো দিকে সে চলে এসেছে। এখানে অত্যন্ত বিচিত্র এক ধরনের ভ্যাপসা গরম, মাথার উপরে সিলিং ফ্যান নামে একটা বিচিত্র জিনিষ পাঁই পাঁই করে ঘুরে তাকে বাতাস দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। এই গরমকে দূর করা যায় না, এই গরমে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হয়।

টুম্পা চোখ বন্ধ করার আগে ঘরটির চারপাশে তাকালো, একটা আলমিরা, পড়ার ডেস্ক, দেওয়ালে কয়েকটা ছবি। একটা ছবিতে তার চোখ আঁটকে গেল। ছোট একটা বাচ্চার ছবি। ছবিটাকে তার পরিচিত মনে হচ্ছে, কোথায় দেখেছে সে এই ছবি? প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করতে করতে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল টুম্পা।

দেয়ালে ঝোলানো ছবি

টুম্পার ঘুম ভাঙার পরও সে কিছুক্ষণ মনে করতে পারল না সে কোথায়। কিছু একটা সে খুঁজছে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না এরকম কিছু তার মনে হতে থাকে। চারপাশে এক ধরনের কোলাহল, অপরিচিত শব্দ, শাঁ শাঁ করে কিছু একটা ঘুরছে, বাতাস বইছে সেখান থেকে কিন্তু তার মাঝে অদ্ভুত ভ্যাপসা এক ধরণের গরম। টুম্পা চোখ খুললো এবং হঠাৎ করে তার মনে পড়লো সে বাংলাদেশে এসেছে। সে এখানে চার সপ্তাহ থাকবে, আজ তার প্রথম দিন। ছোট খালার বাসায় সুমির বিছানায় সে শুয়ে আছে, শাঁ শাঁ শব্দটা আসছে মাথার উপরের সিলিং ফ্যান থেকে। বাইরে এক ধরনের কোলাহল, গাড়ির হর্ন, বাস ট্রাকের গর্জন, রিক্সার বেল মানুষের গলার আওয়াজ, তার মাঝে একটা কাক কা কা করে ডেকে উড়ে গেল। ঠিক কী কারণ জানা নেই টুম্পার ভেতরে এক ধরনের দুঃখ দুঃখ ভাব এসে ভর করেছে। কোনো কারণ নেই তবু তার মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায়, কীভাবে এটা হয় কে জানে? টুম্পা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে শুয়ে রইলো, চোখ ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে টানানো ছবিটার দিকে গেল এবং সে তখন বিছানা থেকে নেমে এল।

এক দুই বছরের একটা হাসি খুশি বাচ্চার ছবি। বাচ্চাটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির এক ধরনের হাসি, ঠিক কী কারণ জানা নেই কিন্তু ছবিটাকে তার খুব পরিচিত মনে হয়। আগে যেন কোথায় দেখেছে। কলম আর তুলি দিয়ে আঁকা, ছবিটা যে এঁকেছে সে নিশ্চয়ই অসাধারণ একজন শিল্পী, ঠিক যে কয়টা কলমের আঁচড় আর যে কয়টা তুলির স্পর্শ দেয়া দরকার, ঠিক সেই কয়টা দিয়েছে, তার থেকে একটি বেশিও নেই একটি কমও নেই। ছবিটাতে অপ্রয়োজনীয় একটা দাগ নেই, একজন মানুষ কেমন করে এতো পরিচ্ছন্ন ছবি আঁকতে পারে? সবচেয়ে বড় কথা এতো অল্প আঁচড়ে যে ছবিটা

এঁকেছে সেটা একটা অসাধারণ ছবি, শিশুটির চোখে এক ধরনের বিস্ময় যেটা শুধুমাত্র এই বয়সের শিশুর চোখে দেখা যায়, ঠোঁটের কোণার হাসিটুকু মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়বে! কী সাধারণ একটা ছবি কিন্তু কী অসাধারণ—টুম্পা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

ঠিক তখন সাবধানে দরজা খুলে ছোট খালা ঘরে উঁকি দিলেন, টুম্পাকে দেখে খুশি খুশি গলায় বললেন, "ও! তুই উঠে গেছিস?"

"হ্যাঁ। ছোট খালা উঠেছি।"

"যেভাবে ঘুমাচ্ছিলি আমার মনে হচ্ছিল আজ বুঝি আর উঠবি না।"

"হ্যাঁ ছোট খালা। একেবারে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। এটাকেই নিশ্চয়ই বলে জেট লেগের ঘুম।"

"হাত মুখ ধুয়ে আয়, কিছু একটা খাবি—"

টুম্পা বলল, "ছোট খালা।"

"কী?"

"এই ছবিটা কে এঁকেছে?"

ছোটখালা ছবিটার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বললেন, "ও মা! বুঝতে পারিস নি?"

"না তো—"

"এটা তোর ছবি। তোর বাবার আঁকা—"

"আমার বাবা?" টুম্পা চমকে উঠলেন, "আ-আমার-বাবা?"

"হ্যাঁ। তোর বাবা যদি পাগল হয়ে না যেতো তাহলে অনেক বড় আর্টিস্ট হতো।"

"আমার বাবা ছবি আঁকতো?"

"ও মা! তুই জানিস না বুঝি?"

"না।"

"তোর বাবা তো আর্টিস্ট ছিল, খুব সুন্দর ছবি আঁকতো। তুই যে এতো সুন্দর ছবি আঁকিস সেটা কী এমনি এমনি?"

টুম্পা এখন ছবিটার আরেকটু কাছে এগিয়ে যায়, ছবির এক কোণে টানা হাতে সিগনেচার, বুলবুল রায়হান। তার বাবার নাম বুলবুল রায়হান, টুম্পা রায়হানের বাবা বুলবুল রায়হান। টুম্পা তার বাবার নামটুকু ছাড়া আর কিছু জানেনা। এখন বাবার হাতে আঁকা একটা ছবি দেখছে, তার নিজের ছবি। তার

বাবা নিশ্চয়ই গভীর ভালোবাসায় এই ছবিটি এঁকেছিলেন, হঠাৎ করে টুম্পার চোখে পানি এসে যায়।

"তোর মা তোকে কোনোদিন কিছু বলে নাই?"

টুম্পা আবার মাথা নাড়লো। ছোট খালার মুখটা কেমন জানি গম্ভীর হয়ে যায়, মানুষটা অসম্ভব হাসিখুশি মানুষ গম্ভীর হতে জানেই না, কষ্ট করে গম্ভীর হলে তাকে অপরিচিত মানুষের মতো দেখাতে থাকে। ছোট খালা অপরিচিত মানুষের মতো মুখ করে বললেন, " তোর বাবার কারণে তোর মা অনেক কষ্ট পেয়েছে তো—"

টুম্পা খপ করে ছোট খালার হাত ধরে বলল, "আমাকে বলবে ছোট খালা?"

ছোট খালা টুম্পাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "বলব না কেন। নিশ্চয়ই বলব।"

"তাহলে বল।"

"এখনই শুনতে হবে কেন। কোনো একদিন সময় করে বলব।"

টুম্পার গলাটা ভেঙে আসে, কোনোমতে বলল, "ছোটখালা।"

"কী মা?"

"শুধু একটা জিনিস বল।"

"কী জিনিস?"

"আমার আব্বু কী এখনো বেঁচে আছেন?"

ছোট খালা টুম্পাকে শক্ত করে ধরে বললেন, "কে বলবে মা? তোর মা এখানে থাকতেই একবার সুইসাইড করার চেষ্টা করল। এখন কী করেছে কে জানে? বেঁচে থাকলেও কোথায় আছে কেমন আছে কে বলবে? তোর আব্বু কপালে শুধু দুঃখ নিয়ে এসেছিল। তোর মতো এতো মায়াভরা একটা মেয়ে সে দেখতে পেলো না—" ছোট খালা টুম্পাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

কান্নার শব্দ শুনেই হোক বা এমনিতেই হোক ঠিক তখন সুমি ঘরে এসে ঢুকলো, এক নজর তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আম্মু! ভালো হচ্ছে না আম্মু! তুমি এইভাবে টুম্পা আপুকে টর্চার করতে পারবে না।"

ছোট খালা টুম্পাকে ছেড়ে দিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন; বললেন, "ঠিক আছে যা। টর্চার করব না।"

বিকেলবেলা সুমি টুম্পাকে নিয়ে বের হয়েছে। ছোট খাটো কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে সেগুলো কিনে টুম্পাকে নিয়ে দোকানপাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এলাকাটা বড়লোকদের, দোকানগুলো ঝকঝকে তকতকে, ভেতরে সাজানো গোছানো, কিন্তু দোকান থেকে বের হলেই দেখা যায় গরিব মানুষ। টুম্পা এই গরিব মানুষগুলো থেকে চোখ সরাতে পারে না, তার মনে হতে থাকে সে বুঝি ন্যাশনাল জিওগ্রাফির একটা চ্যানেলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চারপাশে এতো মানুষ, মানুষগুলোর মাঝে এক ধরনের বিবর্ণ ভাব। পথে ঘাটে ভিক্ষুক। বিকলাঙ্গ মানুষ শুয়ে শুয়ে গান করে ভিক্ষা করছে। কী আশ্চর্য লাগে দেখলে।

টুম্পাকে নিয়ে সুমি একটা হ্যান্ডিক্র্যাফটের দোকানে ঢুকেছে কী একটা কিনে দাম দেয়ার জন্যে কাউন্টারে অপেক্ষা করছে, তখন টুম্পা বাইরে বের হয়ে ফুটপাথে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সামনে রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি বাস টেম্পু যাচ্ছে। টুম্পা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। এতো ছোট একটা রাস্তা দিয়ে এতোগুলো গাড়ি এতো গায়ে গায়ে লেগে কেমন করে যেতে পারে টুম্পার সেটা বিশ্বাস হয় না।

"আপা দুইটা টাকা দিবেন।" রিনরিনে একধরনের গলার আওয়াজ শুনে টুম্পা চমকে উঠলো—ছোট একটি বাচ্চা মেয়ে মুখটাকে যতোটুকু সম্ভব করুণ করে তার সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে। টুম্পার জীবনে কখনো এরকম একটা কিছু ঘটে নি। সে অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকালো, মেয়েটার খালি গা, নাকে একটা নাকফুল ঠোঁট দুটো টকটকে লাল, কী দিয়ে ঠোঁটকে লাল করেছে কে জানে। বড় বড় কালো চোখ মাথা ভরা লালচে চুল। মুখটাকে আরো করুণ করে বলল, "দিবেন দুইটা টাকা? ভাত খামু।"

টুম্পা থতমত খেয়ে বলল, "দুই টাকা দিয়ে ভাত পাওয়া যায়?"

মেয়েটা তখন ফিক করে হেসে ফেলল, এবং টুম্পা বুঝতে পারলো আসলে ভাত খাওয়ার কথাটি বলেছে সমবেদনা পাওয়ার জন্যে। দুই টাকা দিয়ে ভাত হয় না, মেয়েটা তখন বলল, "তাহলে লজেন্স খামু।"

এটা তবু মোটামুটি একটা যুক্তির কথা। এতো ছোট একটা বাচ্চা মেয়ে এই বয়সে ভিক্ষে করছে, টুম্পার কেমন জানি অস্বস্তি হয়। সে নরম গলায় বলল, "আমার কাছে তো দুই টাকা নেই। তোমার একটা ছবি তুলে দেই?"

মেয়েটার করুণ মুখ মুহূর্তে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বড় বড় চোখ করে বলে, "দেন।"

টুম্পা তার ডিজিটাল ক্যামেরাটা বের করল, বাংলাদেশে এসে এটি হবে তার প্রথম ছবি। মেয়েটি দুই হাত পাশে নিয়ে প্রায় এটেনশান হয়ে থাকার ভঙ্গীতে দাঁড়ালো, টুম্পা বলল, "একটু হাসো।"

মেয়েটি সাথে সাথে ফিক করে হেসে দেয়। টুম্পা শাটার টিপতেই মেয়েটির হাসি মুখ ছবিতে আটকা পড়ে যায়—চমৎকার একটা ছবি হয়েছে, দেখে টুম্পার মনটা ভালো হয়ে গেল। টুম্পা মেয়েটাকে ডাকলো, "এই দেখো তোমার ছবি।"

ছবিটা দেখে মেয়েটা চমৎকৃত হয়ে যায়, "আমার ছবি। এইখানে দেখা যায়। ছোডু টেলিভিশন?"

"না। এটা টেলিভিশন না, এটা ক্যামেরা।"

"কী সুন্দর!"

"হ্যাঁ। অনেক সুন্দর। তোমার নাম কী?"

"ময়না।"

"ময়না, তোমার ঠোঁট দুটি এরকম লাল করেছ কেমন করে?"

ময়না দাঁত বের করে হেসে কোমরে গুঁজে রাখা এক টুকরো পাতলা লাল কাগজ বের করে দেখালো। এটা চিবিয়ে ঠোঁটে ঘষলেই ঠোঁট লাল হয়ে যায়!

ময়নার সাথে কথা বলার সময় কীভাবে কীভাবে জানি তার বয়সী অনেকগুলো বাচ্চা ধীরে ধীরে টুম্পাকে ঘিরে দাঁড়ালো। সবাই মুখটা করুণ করে হাত পেতে বলতে লাগলো, "দুইটা টাকা দেবেন? ভাত খামু।"

ময়না উত্তেজিত গলায় বলে, "এই আফা ফটো তুলে। আমার ফটো তুলছে।"

সাথে সাথে সবাই হাত নামিয়ে বলতে লাগলো, "আমার ফটো। আমার ফটো।"

টুম্পা তখন একজন একজন করে সবার ফটো তুলতে লাগলো। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হবে এবং না হাসা পর্যন্ত সে ফটো তুলবে না জানার পরেও একজন কিছুতেই হাসতে রাজি হচ্ছিল না, শেষ পর্যন্ত তাকে হাসতে বাধ্য করার পর রহস্যটা বোঝা গেল, তার সামনের দুটো দাঁত নেই।

সুমি দোকান থেকে বের হয়ে দেখে টুম্পা ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাকে ঘিরে একটা ছোটখাটো ভীড়! সুমি প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও একটু পরেই বুঝে গেল এখানে বড় কোনো সমস্যা নেই, টুম্পা হতদরিদ্র বাচ্চাগুলোর ছবি তুলছে। ছবি তুলে তাদের দেখাচ্ছে!

টুম্পা আর সুমি যখন বাসায় ফিরে যেতে থাকে তখন দীর্ঘসময় টুম্পা চুপ করে রইল। সুমি বলল, "টুম্পা আপু তুমি কী ভাবছ?"

"না কিছু না।" টুম্পা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "না আমি আসলে কিছু ভাবছি না।"

ভোর রাতে টুম্পার ঘুম ভেঙে গেল, আর কিছুতেই চোখে ঘুম এল না। এটাকে নিশ্চয়ই জেট লেগ বলে, বাংলাদেশে এখন ভোর রাত তিনটা হতে পারে কিন্তু আমেরিকার সময় অনুযায়ী এখন দুপুর দুইটা। একজন মানুষ দুপুর দুইটার সময় কেমন করে ঘুমায়? টুম্পা খানিকক্ষণ বিছানায় ওলট-পালট করে উঠে পড়লো। মশারির ভেতর বসে থেকে সে চারিদিক দেখছে, কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে সবকিছু। বাংলাদেশে মশারির ভেতর ঘুমাতে হয় সেটা আগেই জানতো, তার ধারণা ছিল মশারির ভেতর শুতে গিয়ে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু মোটেও তা হলো না। বরং তার মনে হতে লাগলো ছোট একটা পুতুলের ঘরের মাঝে শুয়ে আছে!

টুম্পা মশারি তুলে সাবধানে বের হয়ে এল। বাসার সবাই ঘুমাচ্ছে, তাই সে কোনো শব্দ না করে পা টিপে টিপে ডাইনিং টেবিলে রাখা পানির বোতল থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেলো তারপর পা টিপে টিপে বাইরের ঘরে এল। সুইচটা খুঁজে বের করতে একটু সময় নিলো, সুইচ টিপতেই ঘরে আলো জ্বলে ওঠে ঠিক তখন কিলবিল করে কী একটা যেন দেওয়ালের ওপর দিয়ে দৌড়ে গেল, আতংকে টুম্পা প্রায় চিৎকার করে উঠছিল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলো। আজ সন্ধ্যেবেলা সে এই প্রাণীটাকে দেখেছে, এটা এক ধরনের সরীসৃপ, সবাই এটাকে ডাকে টিকটিকি। বাসার ভেতরে এই ছোট ছোট সরীসৃপগুলো ঘুরে বেড়ায় কেউ কিছু মনে করে না! টুম্পা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে টিকটিকিটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বুকের ধুকপুকুনিটা একটু কমার পর সে সোফার মাঝে বসে, টেবিলে কয়েকটা খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। টুম্পা তার একটা নিয়ে বসে বসে

ছবিগুলো দেখতে থাকে। বাংলাদেশের মেয়েরা অসম্ভব সুন্দরী, কী সুন্দর কুচকুচে কালো চুল আর চোখগুলো কী সুন্দর।

খুট করে ঘরের ভেতর একটা শব্দ হলো, টুম্পা তাকিয়ে দেখে ছোট খালা দরজার সামনে ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছেন। অবাক হয়ে বললেন, "টুম্পা! এতো রাতে বসে বসে কী করছিস?"

"জেট লেগ!" টুম্পা হাসার চেষ্টা করে বললো, "আর ঘুম আসছে না, তাই বসে বসে ম্যাগাজিন দেখছি!"

ছোট খালা এগিয়ে এসে বললেন, "কিছু খাবি?"

টুম্পা আবিষ্কার করলো শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু সত্যি তার বেশ খিদে লেগেছে। সে অবশ্যি স্বীকার করলো না, জোরে জোরে মাথা নাড়লো, বলল, "না ছোট খালা কিছু খাব না।"

"মুখটা ছোট হয়ে আছে। নিশ্চয়ই তোর খিদে পেয়েছে। কী খাবি?"

"না ছোট খালা, না।"

"আমার সাথে ভদ্রতা করবি না। পরটা ভেজে দিই? গরুর গোশত আছে, গরম করে দিই?"

"না, ছোট খালা না—" বলার সময়েই টুম্পা আবিষ্কার করলো তার গলায় সেরকম জোর নেই!

ছোট খালা ফ্রিজ খুলে খাবার বের করে রান্নাঘরে নিয়ে চুলো জ্বালিয়ে খাবার গরম করতে লাগলেন। টুম্পা ভদ্রতা করে আরও এক-দুইবার আপত্তি করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ছোট খালাকে সাহায্য করতে লাগলো।

ছোট খালা খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে কাছাকাছি বসলেন। টুম্পার প্লেটে খাবার তুলে দিতে দিতে বললেন, "নে, খা। তোর মতো বয়স থাকলে আমি রাক্ষসের মতো খেতাম!"

টুম্পা বলল, "আমি রাক্ষসের মতোই খাচ্ছি। তুমি এখন গিয়ে ঘুমাও।"

"আমার ঘুম নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না।"

"আমার খুব লজ্জা লাগছে ছোট খালা—"

"তুই দেখি তোর বাপের মতো শুরু করলি—"

টুম্পা মুখ তুলে ছোট খালার দিকে তাকালো, বলল, "আব্বুর মতোন? কী করতো আব্বু?"

ছোট খালা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পাগল হয়ে যাবার আগে তোর আব্বু ছিল একেবারে খাঁটি ভদ্রলোক। তোর মায়ের সাথে বিয়ে হবার পর প্রথমবার যখন শ্বশুরবাড়ি এসেছে আমরা নতুন জামাইকে কতো যন্ত্রণা করেছি মানুষটা মুখ বুঁজে সহ্য করেছে—"

"ছোট খালা।"

"কী?"

"আব্বুর কোনো ছবি আছে?"

"থাকার তো কথা। দাঁড়া খুঁজে বের করি—" ছোট খালা শেলফ থেকে কয়েকটা এ্যালবাম নামিয়ে নিয়ে এসে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে একটা ছবি বের করলেন। বললেন, "এই যে তোর আব্বু।"

টুম্পার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, অসম্ভব সুন্দর একজন মানুষ তার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। বড় বড় এলোমেলো কালো চুল, ঝকঝকে দুটি চোখ। তার নিজের আব্বু? টুম্পার চোখে হঠাৎ পানি এসে যায়।

ছোট খালা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তোর বাবা তোকে অসম্ভব আদর করতো। যখন পাগল হয়ে গেল তখন মাঝখানে একটা সময় তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হতো। অসম্ভব ভায়োলেন্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তোকে দেখলেই একেবারে শান্ত হয়ে যেতো। তুই তখন ছোট সবাই ভয় পেতো যদি হঠাৎ করে কিছু একটা করে ফেলে—"

"আব্বু পাগল হলো কেমন করে?"

ছোট খালা মাথা নাড়লেন, বললেন, "জানি না। আগে থেকেই মনে হয় একটু সমস্যা ছিল। মাঝে মাঝে গুম হয়ে যেতো কারো সাথে অনেকদিন কথা বলতো না। আমরা ভাবতাম শিল্পী মানুষের মুড! আস্তে আস্তে সমস্যাটা বাড়তে লাগলো রাতে ঘুমাতো না, সারারাত ছাদে হাঁটতো—"

"চিকিৎসার ব্যবস্থা করে নাই?"

"করে নাই আবার! অনেক চেষ্টা করেছ। কিছুতেই ডাক্তারের কাছে যাবে না, অনেক ধরে বেঁধে নেয়া হলো, ডাক্তার কঠিন একটা নাম বললো, সিজোফ্রেনিয়া না কী যেন—"

টুম্পা বলল, "স্কিৎজোফ্রেনিয়া?"

"হ্যাঁ তাই হবে। ওষুধ পত্র দিলো, সেগুলো খেতে চায় না। খুব বড় একটা এক্সিবিশান হবে, তার জন্যে ছবি আঁকার কথা, রাত জেগে ছবি আঁকে। সেই

ছবিগুলো দেখে ভয় লাগে। মজার ব্যাপার জানিস, অনেক দাম দিয়ে সেই ছবি বিক্রি হয়ে গেল, অসাধারণ সব ছবি ছিল।"

"কোথায় আছে ছবিগুলো?"

"জানি না। বিদেশিরা কিনে নিয়ে গেছে। পত্রিকায় অনেক ভালো ভালো রিভিউ বের হয়েছিল।"

"আছে রিভিউগুলো?"

"থাকলেও খুঁজে পাব না। এই বাসায় কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।"

টুম্পা বলল, "আব্বু আর কী কী করতো ছোট খালা?"

"ছবি আঁকার ব্যাপারে খুব নাম করেছিল। দেশে বিদেশে এক্সিবিশান হয়েছে। মানুষটা পাগল না হয়ে গেলে এখন অনেক নাম ডাক হতো।"

"আম্মুর সাথে ছাড়াছাড়ি হলো কখন?"

ছোট খালা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, "তোর মায়ের সাথে অনেকদিন থেকে সমস্যা হচ্ছিল, আমাদেরকে কিছু জানায় নি। একদিন অনেক রাতে তোর মা এসে হাজির, শরীরে মারের দাগ, ছেঁড়া জামা কাপড়। এসে হাউমাউ করে কান্না—আমরা তো অবাক। প্রথমে কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে তোর আব্বু বাসার সব কিছু ভেঙেচুরে শেষ করে রেখেছে। সব বই ছিঁড়ে কুটি কুটি করে রেখেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ লাল, এতো বড় একটা চাকু নিয়ে বসে আছে—"

টুম্পা বুকের ভেতর থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ। আমাদের মনে হলো মানুষটা মরে গেলে বুঝি আমরা কম দুঃখ পেতাম। যাই হোক ধরে বেঁধে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো, লাভ হলো না। শুধু চিৎকার করে টুম্পা টুম্পা— তোকে দেখার জন্যে পাগল। কিন্তু এতো ভায়োলেন্ট তাই তোকে কাছে নিতে কেউ সাহস করল না। এর মাঝে তোর মায়ের ডিভি হয়ে গেল। আমরা কেউ জানতাম না, লুকিয়ে এপ্লাই করে রেখেছিল। আমরা সবাই না করলাম, আমাদের কারো কথা শুনল না, একরকম জোর করে তোকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেল।"

"আর আব্বু?"

"এক ক্লিনিক থেকে আরেক ক্লিনিকে। প্রথম কিছুদিন আমরা জানতাম তারপর আস্তে আস্তে আর খবর পেতাম না। মানুষটার আত্মীয় স্বজনেরা কেউ ছিল না, বন্ধু বান্ধবেরা একটু চেষ্টা করেছিল।"

"তোমার কী মনে হয় ছোট খালা? আব্বু কী বেঁচে আছে?"

"কেমন করে বলি! বেঁচে থাকলেই কেমন আছে, কে বলবে? আমাদের দেশে এরকম মানুষজনের বেঁচে থাকা খুব কঠিন।"

"ছোট খালা।"

"কী মা?"

"আমি কী আমার আব্বুকে খুঁজে বের করতে পারব?"

"তুই?"

"হ্যাঁ।"

ছোট খালা কিছুক্ষণ টুম্পার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কেমন করে বলি? এই দেশে ছোট কাজটাই এতো কঠিন, আর কঠিন কাজটা তো অসম্ভব। তাছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"ধরা যাক তুই তোর বাবাকে খুঁজে পেলি। তারপর?"

"তারপর কী?"

"তোর যদি আরও অনেক বেশি মন খারাপ হয়ে যায়?"

টুম্পা কিছুক্ষণ ছোট খালার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তাহলে আমি সেটাই চাই ছোট খালা। আরো অনেক বেশি মন খারাপ করতে চাই। অনেক অনেক বেশি।"

ছোট খালা একটু অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বুলবুল রায়হান

রুমি টেবিলে একটা কাগজ রেখে একটা কলম নিয়ে বসেছে। তার পাশে বসেছে সুমি আর টুম্পা। রুমি বলল, "প্রথমে দেখা যাক ঢাকায় দেখার মতো কী কী আছে! এক নম্বর, স্মৃতিসৌধ।"

সুমি বলল, "স্মৃতিসৌধ ঢাকায় তোকে কে বলেছে? স্মৃতিসৌধ হচ্ছে সাভারে।"

"সাভার আর ঢাকা তো কাছাকাছিই হলো।"

সুমি বলল, "কোনোদিন কাছাকাছি না। সাভার অনেকদূর।"

"মোটেও দূর না।"

দুই ভাই বোনে তর্কাতর্কি লেগে যাচ্ছিল টুম্পা তাদেরকে থামালো। তখন রুমি বলল, "শহীদ মিনার।"

সুমি বলল, "সংসদ ভবন।"

রুমি বলল, "মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।"

সুমি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।"

রুমি প্রশ্ন করল, "চিড়িয়াখানা?"

সুমি হাসার ভঙ্গি করে বলল, "ধূর! আমেরিকায় কতো ফাটাফাটি চিড়িয়াখানা আছে। এইখানে শুকনা শুকনা আধমরা কয়টা জন্তু দেখে কী করবে?"

রুমি মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক।"

সুমি বলল, "টুম্পা আপুকে একটা কাঁচা বাজারে নিয়ে যেতে হবে।"

টুম্পা জানতে চাইলো, "কাঁচা বাজার কী?"

"কাঁচা বাজারে মাছ মাংস শাক সবজি বিক্রি হয়। তুমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। আম্মুকে নিয়ে যেতে হবে তাহলে দেখবে কেমন করে দরদাম করতে হয়!"

টুম্পা বলল, "আমি একটা আর্ট মিউজিয়ামেও যেতে চাই। বাংলাদেশের আর্টিস্টদের আঁকা ছবি দেখতে চাই।"

সুমি চোখ বড় বড় করে বলল, "দাঁড়াও!"

"কী হয়েছে?"

"একটা বড় পেইন্টিং এক্সিবিশান শুরু হবে। চারুকলায়।"

"কবে থেকে?"

"দাঁড়াও দেখি।" সুমি খবরের কাগজ নিয়ে এসে বিজ্ঞাপনটা দেখে বলল, "আজ থেকে শুরু। তিনটার সময় ওপেনিং। চারুকলায়।"

টুম্পা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে বলল, "আচ্ছা সুমি, এই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে কতো লাগে তুমি জান?"

"বিজ্ঞাপন?"

"হ্যাঁ।"

"কিসের বিজ্ঞাপন?"

"না এমনিই, ছোট একটা বিজ্ঞাপন।"

সুমি কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেল। টুম্পা একটু ইতস্তত করে বলল, "তুমি একটু খোঁজ নিতে পারবে?"

"পারব। আমি ফোন করলে আমাকে পাত্তা দিবে না। আম্মুকে দিয়ে ফোন করাতে হবে।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

সাভারের স্মৃতিসৌধ দেখে ফিরে আসতে আসতে তাদের দেরি হয়ে গেল। তাদের ইচ্ছে ছিল চারুকলায় ছবি প্রদর্শনীর শুরু অনুষ্ঠানটি দেখবে। এসে দেখে অনুষ্ঠানটি শেষ, সবাই এক্সিবিশান দেখছে। টুম্পা খুব আগ্রহ নিয়ে গ্যালারির ভেতরে ঢুকে গেল, ছবির প্রদর্শনী দেখতে তার খুব ভালো লাগে। প্রথম দিন বলে অনেক কয়টা টেলিভিশন ক্যামেরা এসেছে, শিল্পীরা ছবির সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গী করতে লাগলেন আর সাংবাদিকেরা তাঁদের ছবি নিতে লাগলো। টুম্পা সেই ভীড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ছবিগুলো দেখতে থাকে। এতোদিন সে যত ছবি দেখেছে সবগুলো পশ্চিমা দেশের—এই দেশের ছবির যে একটা অন্য ধারা আছে সেটা সে জানতো না,

দেখে তার খুব মজা লাগতে থাকে। পার্থক্যটা ঠিক কোথায় সে বুঝতে পারে না কিন্তু অনুভব করতে পারে, ভারি বিচিত্র সেই অনুভূতি।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে টুম্পা একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে গেল, বিশাল একটা ক্যানভাসের মাঝে রংগুলো সব উজ্জ্বল। হালকা নীল রঙের একটা মানুষের ছায়া কেমন যেন ভাঁজ হয়ে শুয়ে আছে পাশে একটা ছোট সবুজ গাছ। টুম্পা চোখে হাত দিয়ে সবুজ গাছটা আড়াল করে দেখলো ছবিটাকে তখন কেমন জানি সাদা মাটা মনে হয়, এই ছোট গাছটা এই রং দিয়ে ঠিক এইখানে বসানোর জন্যে ছবিটা অন্যরকম হয়ে গেছে। আর্টিস্ট মানুষটি কেমন করে বুঝতে পারে এটি করতে হবে? সে কী কখনো এরকম একজন আর্টিস্ট হতে পারবে?

"কী দেখছ তুমি এমন করে?"

মাঝ বয়সী একজন মানুষ টুম্পার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, টুম্পা একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, "না, মানে ইয়ে দেখছি।"

"ভালো লাগছে ছবিটা?"

"জি। খুব ভালো লাগছে। আগে কখনো এরকম ছবি দেখি নাই।"

"কেন? তুমি এক্সিবিশানে আস না?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল,"না আমি আসলে বাংলাদেশে থাকি না।"

"তাই তো বলি—তোমার বাংলা উচ্চারণের এই অবস্থা কেন!" মানুষটি হা হা করে হাসতে হাসতে তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "কিন্তু বাংলা বলছ এইটাই অনেক। সেইজন্যে কংগ্রাচুলেশন।"

"থ্যাংক ইউ।"

"নাও। ছবি দেখো।" ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "এই ছবিটা কে এঁকেছে?"

"আমি।"

"আপনি!" টুম্পা উচ্চসিত হয়ে ওঠে, "ইশ! আপনি কী সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন। আমি যদি আপনার মতো ছবি আঁকতে পারতাম!"

"সখ থাকলে পারবে না কেন, একশোবার পারবে।" শিল্পী ভদ্রলোক টুম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, "ছবি আঁক তুমি?"

"জি চেষ্টা করি। কোনো ট্রেনিং নাই আমার। এমনি আঁকি।"

"ভেরি গুড।"

টুম্পার কী মনে হলো কে জানে, বলল, "আমার আব্বুও আর্টিস্ট ছিলেন।"

"কী নাম তোমার আব্বুর?"

"বুলবুল রায়হান।"

শিল্পী মানুষটি মনে হলো একটা ইলেকট্রিক শক খেলেন, চমকে উঠে বললেন, "তু-তুমি বুলবুলের মেয়ে?"

"আপনি আমার আব্বুকে চিনেন?"

টুম্পার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছে এখন বুলবুল?"

"আমি তো জানিনা। আমার আব্বু কোথায় তাও তো জানিনা। আসলে আসলে—"

"আসলে কী?"

"আসলে আমার আব্বু বেঁচে আছেন কী না সেইটাও জানি না।"

শিল্পী মানুষটা গম্ভীর মুখ করে বললেন, "বেঁচে আছে নিশ্চয়ই। বেঁচে না থাকলে আমরা খবর পেতাম।"

"আমার আব্বুকে কোথায় খুঁজে পাব আপনি জানেন?"

"না। আমি তো জানিনা—"

"আপনি কী কাউকে চিনেন যে জানে?"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বলল, বুলবুল আমাদের থেকে দুই বছর জুনিয়র ছিল। শামীমের সাথে তার খাতির ছিল। আর জাহেদ। তাদের সাথে যোগাযোগ করলে হয়তো বলতে পারবে।"

"তাদের কোথায় পাব?"

"শামীম তো এখানেই আছে। এক্সিবিশনে শামীমের ছবিও আছে। আস আমার সাথে, দেখি খুঁজে পাই কী না।"

বাইরে এক জায়গায় চা কফির আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে কয়েকজন সিগারেট খেতে খেতে গল্প করছিল। ভদ্রলোক টুম্পাকে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন, ছোটখাটো একজন মানুষকে ডেকে বলল, "শামীম, এই যে এই মেয়েটি বুলবুলের মেয়ে।"

"কোন বুলবুল?"

"মনে নেই? বুলবুল রায়হান।"

"তাই নাকি?" ছোটখাটো মানুষটা এগিয়ে আসে, "তুমি বুলবুলের মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তো জানতাম ওর ওয়াইফ মেয়েটাকে নিয়ে আমেরিকা চলে গেছে।"

"জি। আমি আমেরিকা থেকে এসেছি।"

"ও!" মানুষটা টুম্পার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, "কী নাম তোমার?"

"টুম্পা। টুম্পা রায়হান।"

"হ্যাঁ। তাইতো। বুলবুলের মেয়ের নাম ছিল টুম্পা! তুমি এতো বড় হয়েছ?"

টুম্পার নিঃশ্বাস আটকে যায়, "আমার আব্বু কোথায় আছে আপনি জানেন?"

"মোহাম্মদপুরের দিকে থাকতো। বছর দুয়েক আগের কথা। এখন যে কোথায় আছে—"

"কেউ কী বলতে পারবে? আপনি জানেন?"

ছোট মানুষটা সিগারেট টানতে টানতে কী যেন ভাবল, ভেবে বলল, "তোমার টেলিফোন নাম্বারটা দাও আমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখি। আসলে সমস্যাটা কী জান?"

"কী?"

"বুলবুল তো নরমাল না, কারো সাথে দেখা করে না কথা বলে না।"

"তা হোক—" টুম্পা বলল, "আমি শুধু দেখতে চাই।"

"সে তো বটেই। তোমার বাবা, তুমি তো দেখতেই চাইবে। অসাধারণ শিল্পী ছিল বুলবুল। অসম্ভব ক্রিয়েটিভ—আমি বুঝি না বেশি ক্রিয়েটিভ মানুষেরই এই সমস্যা হয় নাকি এই সমস্যা হলেই বেশি ক্রিয়েটিভ হয়।"

টুম্পা একটা কাগজ বের করে সেখানে তার নাম লিখলো তারপর ছোট খালার টেলিফোন নম্বর লিখলো লিখে শামীম নামের ছোটখাটো মানুষটার হাতে দিয়ে বলল, "আপনার টেলিফোন নম্বরটা দিবেন?"

"হ্যাঁ দিচ্ছি। দাঁড়াও তোমাকে আমার একটা কার্ড দিই।"

কার্ডটা হাতে নিয়ে টুম্পা বলল, "আপনি কখন আমাকে খোঁজ দিতে পারবেন বলে মনে হয়? আসলে আমি তো মাত্র অল্প কয়দিনের জন্যে এসেছি।"

"হ্যাঁ, দেখি। দুই-এক দিন সময় দাও।"

"আমি ভেবেছিলাম আব্বুর ছবি দিয়ে পেপারে একটা বিজ্ঞাপন দেব। তাহলে আমি আপনার জন্যে দুইদিন অপেক্ষা করি?"

"হ্যাঁ। দুইদিন অপেক্ষা কর—"

টুম্পা বিদায় নিয়ে চলে যাবার জন্যে মাত্র ঘুরেছে ঠিক তখন সুমি আর রুমি উদ্বিগ্ন মুখে ছুটে এল। সুমি বলল, "আপু তুমি এখানে? আমরা তোমাকে সব জায়গায় খুঁজেছি।"

"না আমি একটু কথা বলছিলাম।"

রুমি হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আপু! তুমি কোনো পেইন্টিং কিনবে নাকি?"

টুম্পা হাসল, বলল, "পেইন্টিং তো না, খালি ক্যানভাস কেনার টাকা আছে আমার!"

সুমি হি হি করে হেসে বলল, "খারাপ না আইডিয়াটা! একটা ক্যানভাস কিনে নিচে লিখে রাখবে—এই খানে বিখ্যাত একটা পেইন্টিং আঁকা হবে!"

সুমির উত্তরে রুমি জানি কী একটা বলল, তার উত্তরে আবার সুমি। টুম্পা তাদের কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না, তার বুকের ভেতর ধুকপুক করছে। সত্যিই কী সে তার আব্বুকে খুঁজে পাবে? তার আব্বু সত্যিই আছেন? কেমন আছেন? তার সাথে কথা বলবেন? প্রথম যখন দেখা হবে কী বলবে সে তার আব্বুকে?

খাবার টেবিলে ছোট খালু টুম্পাকে জিজ্ঞেস করলেন, "টুম্পা, তোমার অবস্থা কী রকম?"

"কেন ছোট খালু?"

"তোমাকে নিয়ে ঢাকা শহর থেকে বের হই। কক্সবাজার রাঙ্গামাটি ঘুরে আসি।"

রুমি মনে করিয়ে দিল, "আর সুন্দরবন।"

"উহুঁ। সুন্দরবন মনে হয় এখন হবে না। সুন্দরবন যেতে হয় শীতকালে। এখন সমুদ্র খুব আনপ্রেডিক্টেবল।"

"সেটাই তো ভালো। ঝড়ের মাঝে সমুদ্র একেবারে ফাটাফাটি।"

সুমি বলল, "হয়েছে! একটু বৃষ্টি হলেই ভয়ে বাথরুমে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়, আর সে ঝড়ের মাঝে যাবে সমুদ্রে!"

"কোনোদিন আমি বাথরুমে গেছি?"

"হয়েছে!" ছোট খালু দুইজনকে থামালেন, "আগে দিনগুলি ঠিক করি। টুম্পা আছে মাত্র চার সপ্তাহ, দেখবি দেখতে দেখতে সময়টা কেটে যাবে। পরশুদিন বৃহস্পতিবার, আমরা রাত্রে রওনা দিতে পারি।"

টুম্পা একটু ইতস্তত করে বলল, " ছোট খালু—"

"কী হলো?"

"আমরা আর কয়েকটা দিন পরে যাই?"

"পরে?"

"হ্যাঁ।"

ছোট খালু কয়েক মুহূর্ত টুম্পার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেনন, "ঠিক আছে! এখন তাহলে আমরা ঢাকা শহর আর তার আশেপাশে যাই।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

গভীর রাতে ছোট খালার ঘুম ভেঙে গেল। বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। ছোট খালা আস্তে আস্তে বাইরে এলেন, টুম্পা সোফায় পা তুলে বসে আছে, তার কোলে এ্যালবামটা, তার আব্বুর ছবিটা বের করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ছোট খালা নরম গলায় ডাকলেন, "টুম্পা।"

টুম্পা মুখ তুলে তাকালো, "ছোট খালা!"

"ঘুম আসছে না?"

টুম্পা হাসার চেষ্টা করে বলল, "ঘুম এসেছিল, ভেঙে গেছে। জেট লেগ, আমেরিকাতে এখন দুপুর।"

"ও!" ছোট খালা পাশে এসে বসলেন, "খিদে পেয়েছে? কিছু খাবি?"

"না না ছোট খালা। খাব না। কিছু খাব না।"

"সত্যি?"

"জি ছোট খালা।" টুম্পা এ্যালবামটা বন্ধ করে রাখতে রাখতে বলল, "ছোট খালা।"

"বল।"

"সেদিন যে পেইন্টিং এক্সিবিশনে গিয়েছিলাম সেখানে যারা আর্টিস্ট ছিলেন, তারা—"

"তারা?"

"তারা আব্বুকে চিনে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ ছোট খালা। তাদের কাছে আমি তোমাদের বাসার টেলিফোন নম্বর দিয়েছি। আব্বুর খোঁজ পেলে আমাকে জানাবে।"

ছোট খালা এক ধরনের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন, ফিস ফিস করে বললেন, "সত্যি?"

"আমার খুব অস্থির লাগছে ছোট খালা! যদি সত্যি তারা আব্বুকে পেয়ে যায় তখন আমি কী করব ছোট খালা?"

ছোট খালা হাত দিয়ে টুম্পাকে নিজের কাছে টেনে এনে বললেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে টুম্পা। সব ঠিক হয়ে যাবে!"

"তুমি আমার সাথে যাবে ছোট খালা?"

"যাব। তোকে আমি নিয়ে যাব।"

"থ্যাংকু ছোট খালা।" টুম্পা ছোট খালাকে ধরে ফিস ফিস করে বলল, "আমার খুব ভয় করছে ছোট খালা। খুব ভয় করছে।"

"ভয়ের কিছু নেই।" ছোট খালা টুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই টুম্পা সোনা।"

ঠিকানা

টুম্পা হাতে অনেকগুলো ছবি নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দুদিন আগে এখানে সে বাচ্চাগুলোর ছবি তুলেছিল। বাচ্চাদের ছবি তোলা হয়েছিল তাতেই তাদের আনন্দের সীমা ছিল না, টুম্পা তখনই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল ছবিগুলো প্রিন্ট করে সে বাচ্চাগুলোকে দেবার চেষ্টা করবে। আজ সে ছবি নিয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাগুলোকে খুঁজছে, সত্যি সত্যি হঠাৎ করে কোথা থেকে দুটি বাচ্চা এসে হাজির হলো! রিনরিনে গলায় বলল, "আপা! দুইটা টাকা দেবেন? ভাত খামু।"

টুম্পা বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো সে তাদের ছবি তুলেছিলো কী না। এতোগুলো বাচ্চার ছবি তুলেছিল যে আলাদা করে তাদের চেহারা মনে করতে পারছিল না, কিন্তু হঠাৎ বাচ্চাগুলো তাকে চিনে ফেললো। তারা আনন্দে চিৎকার করে বলল, "ফটো তোলা আপা! ফটো তোলা আপা!"

"আমি তোমাদের দু'জনের ছবি তুলেছিলাম?"

"হে আপা! আজকে আবার তুলবেন?"

"না। আজকে তোমাদের ছবি দিতে এসেছি।" টুম্পা হাতের ছবিগুলো মেলে ধরলো, "কোনটা তোমাদের?"

দুইজন উত্তেজিত ভাবে তাদের ছবি খুঁজতে থাকে এবং সেটা পেয়ে যাবার পর আনন্দে এতো জোরে চিৎকার করে উঠে যে আশেপাশে মানুষেরা অবাক হয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকালো। কিছু বোঝার আগেই টুম্পাকে ঘিরে ছোট ছোট বাচ্চাদের ভীড় জমে যায়, তারা কাড়াকাড়ি করে নিজেদের ছবি নিয়ে আনন্দে লাফালাফি করতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল বেশ কয়েকজন বাচ্চা, যারা সেদিন ছিল না এবং আজকে এসেছে তারা মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খুব ছোট একজন তার ছবি নেই বলে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো। কাজেই টুম্পাকে আবার নতুন করে তাদের ছবি তুলতে হলো এবং হঠাৎ বাচ্চাদের মাঝে এক ধরনের মারামারি শুরু হয়ে যায়। টুম্পা অনেক কষ্টে তাদের মারামারি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমাদের? মারামারি করছ কেন?"

উত্তেজিত একজন হড়বড় করে বলল, "মইত্যা কতো বড় চোরা, আগের দিন ছবি তুলছে আজকে আরেকবার তুলছে।"

মতি, যাকে মইত্যা বলে ডাকা হচ্ছে গলা ফাটিয়ে প্রতিবাদ করল, "আগে তুলি নাই।"

এইবারে একসাথে কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, "তুলছে।"

একজন বলছে, "নিজের ছবি নিছ।"

মতি তার ছবিটি গেঞ্জির তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে করতে বলল, "নেই নাই।"

এতো বড় মিথ্যা কথার প্রতিবাদ হিসেবে একসাথে কয়েকজন মতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল টুম্পাকে কষ্ট করে থামাতে হলো। সে মুখ শক্ত করে বলল, "খবরদার, নো মারামারি। মারামারি করলে আমি কোনোদিন আসব না।"

টুম্পার কথায় ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। বাচ্চাগুলো সাথে সাথে তাদের মারামারি থামিয়ে টুম্পাকে ঘিরে দাঁড়ালো। ভদ্র চেহারার মানুষেরা কখনো তাদের সাথে ভালো করে কথা বলে না, এরকম সুন্দর একটা আপা শুধু যে তাদের সাথে ভালো করে কথা বলছে তা না, তাদের ছবি পর্যন্ত তুলে দিচ্ছে সেই আপাকে তারা রাগাতে চায় না। টুম্পা বলল, "গুড। কেউ মারামারি করবে না। যাদের ছবি তোলা হয় নাই শুধু তারা আস একজন একজন করে।"

এবারে মোটামুটি ঝামেলা ছাড়াই নতুন বাচ্চাদের ছবি তোলা শেষ হলো। টুম্পা চলে আসার আগে তাকে আবার নতুন ছবি নিয়ে ফিরে আসার কথা দিতে হলো।

টুম্পা বাসায় ফিরে ছোট খালাকে জিজ্ঞেস করল, "আমার কী কোনো ফোন এসেছিল?"

ছোট খালা মাথা নাড়লেন, বললেন, "না, আসে নি।"

টুম্পা পরের দিনটা কাটালো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। প্রথমে শহীদ মিনারে যাবার কথা ছিল, সেখানে অনেক মানুষের ভীড় কেউ একজন খুব রেগে মেগে বক্তৃতা দিচ্ছে অন্য অনেকে তার সাথে সাথে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। টুম্পা এরকম দৃশ্য কখনো দেখে নি, তার আরো দেখার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অন্যেরা রাজি হলো না। তাই তারা চলে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। জাদুঘর কথাটা শুনলেই মনে হয় বিশাল জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একটা কিছু। সেই হিসেবে এই জাদুঘরটা খুবই ছোট। ভিতরে ঢুকে সে অবশ্যি আবিষ্কার করলো খুব গুছিয়ে সবকিছু রাখা আছে। কেউ যদি একেবারে গোড়া থেকে পুরোটুকু দেখতে দেখতে যায় তাহলে এই দেশের ইতিহাসটা মোটামুটি জানা হয়ে যায়। শুরু হয়েছে একেবারে পাকিস্তান ইন্ডিয়া থেকে, তারপর নানা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ইলেকশান বদমাইস ইয়াহিয়া খান তারপর যুদ্ধ! টুম্পা অবাক হয়ে দেখলো কতো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা দেশের জন্যে যুদ্ধ করেছে, দেখে মনে হয় তাদের বুঝি দেশ বলতে কী বোঝায় আর স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝার বয়সই হয় নি কিন্তু যখন প্রাণ দেবার সময় হয়েছে তখন হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে! টুম্পা নিঃশ্বাস বন্ধ করে পুরো জাদুঘরটা দেখলো। ফিরে আসার আগে সে জাদুঘরের বইয়ের দোকান থেকে কয়েকটা বই, একটা পোস্টার আর অনেকগুলো ভিউকার্ড কিনলো। সুমি জিজ্ঞেস করলো, "কেমন লেগেছে এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।"

টুম্পা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কখনো এরকম কিছু দেখি নাই। মনে হয় দেখবও না।"

বাসায় এসে টুম্পা ছোট খালার কাছে ছুটে গেল, " ছোট খালা, আমার কী কোনো ফোন এসেছে?"

ছোট খালা মাথা নাড়লেন, বললেন, "না টুম্পা। কোনো ফোন আসে নি।"

বিকালবেলা টুম্পাকে নিয়ে যাওয়া হলো সংসদ ভবনে। টুম্পা গিয়ে দেখে সেখানে হাজার হাজার মানুষ। একটু অবাক হয়ে সুমিকে জিজ্ঞেস করল, "আজকে এখানে কী হচ্ছে?"

"কিছু না।"

"তাহলে এতো ভীড় কেন?"

সুমি হেসে বলল, "প্রত্যেকদিনই এরকম ভীড় হয়! ঢাকা শহরের মানুষ বিকালে এখানে বেড়াতে আসে।"

টুম্পা বলল, "তাই বল!"

সে তাকিয়ে দেখে আসলেই তাই, যারা এসেছে সবাই সেজেগুজে এসেছে, হাঁটছে, বেড়াচ্ছে, কথা বলছে, বাদাম খাচ্ছে, বেলুন কিনছে। পুরো এলাকাটাতে কেমন যেন আনন্দের একটা ভাব। টুম্পা মানুষজনকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে সংসদ ভবনের দিকে তাকিয়ে থাকে—অত্যন্ত আধুনিক একটা ভবন। এটাকে দেখলে মোটেও একটা ভবনের মতো মনে হয় না, মনে হয় একটা বিশাল ভাস্কর্য্য! প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তৈরি করেছে কিন্তু ভবনটা আশ্চর্য রকম আধুনিক। ইন্টারনেটে পড়েছিল এই ভবনটা নাকি সবসময়েই আধুনিক থাকবে, তখন বুঝতে পারেনি কথাটির অর্থ কী, ভবনটি নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারল আসলে এর অর্থ কী। ভবনটি ডিজাইন করেছেন লুই কান, বেচারা একটা ট্রেন স্টেশনের বাথরুমে হার্টফেল করে মারা গেছেন। এতো বড় একজন মানুষ ট্রেন স্টেশনের বাথরুমে কীভাবে মারা যায়?

টুম্পারা সবাই অন্ধকার নেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, চারপাশ থেকে আলো জ্বেলে দেবার পর সংসদ ভবনটাকে একেবারে অন্যরকম দেখাতে থাকে। টুম্পার আরো কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মশা এসে খুব বিরক্ত করতে শুরু করে দিলো। ফিরে আসার সময় দেখলো একজন জাপানি মানুষ বিশাল একটা ট্রাইপডের ওপর বড় একটা ক্যামেরা বসিয়ে সংসদ ভবনের ছবি তুলছে। মানুষটার চোখে মুখে একধরনের ভ্যাবাচেকার ভাব, সংসদ ভবন দেখে এরকম ভ্যাবাচেকা খেয়েছে নাকি চেহারাটাই এরকম টুম্পা বুঝতে পারল না!

বাসায় ফিরে এসে টুম্পা ছোট খালার কাছে ছুটে গেল, "ছোট খালা।"

"কী মা টুম্পা।"

"আমার কী কোনো ফোন এসেছে?"

"না রে! কোনো ফোন আসে নি।"

"ও!" টুম্পার মুখের আলো দপ করে নিভে যায় হঠাৎ।

রাত্রিবেলা যখন সবাই খেতে বসেছে, রুমি তাদের একজন স্যার কেমন করে পড়ায় সেটা অভিনয় করে দেখাচ্ছে ঠিক তখন একটা টেলিফোন এল। এই বাসায় কার পরে কে টেলিফোন ধরবে তার একটা নিয়ম আছে, এর আগেরটা

ধরেছিল সুমি তাই অভিনয় বন্ধ করে একটা যন্ত্রণার মতো শব্দ করে রুমি টেলিফোনটা ধরতে গেল। প্রায় সাথে সাথে ফিরে এসে টুম্পাকে বলল, "টুম্পা আপু তোমার ফোন।"

টুম্পার হঠাৎ করে মনে হলো তার নিঃশ্বাস আটকে যাবে। খানিকটা হতচকিতের মতো জিজ্ঞেস করলো, "আমার?"

"হ্যাঁ, তোমার।"

টুম্পা ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে ড্রয়িংরুমে গিয়ে টেলিফোনটা ধরে কাঁপা গলায় বলল, "হ্যালো।"

অন্য পাশ থেকে একজন ভারী গলায় বললেন, "টুম্পা?"

"জি।"

"আমি শামীম আহমেদ বলছি। ঐ যে সেদিন এক্সিবিশনে দেখা হলো—"

"জি। বুঝতে পেরেছি।"

"আমি শেষ পর্যন্ত একজনকে খুঁজে পেয়েছি যে বুলবুলের খোঁজ জানে।"

টুম্পার মনে হলো তার হৃৎস্পন্দন বুঝি থেমে গেছে। শামীম আহমেদ নামের মানুষটি বললেন, "বুলবুলের খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল। নাম শুভ চৌধুরী। একটা খবরের কাগজের স্টাফ আর্টিস্ট—"

টুম্পার মনে হলো তার চারপাশের সবকিছু বুঝি তাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করেছে। সে খুব ধীরে ধীরে মেঝেতে বসলো, তার মনে হতে লাগলো সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

"শুভ চৌধুরী একটু পাগলা টাইপের, ফাইন আর্টের ছাত্র ছিল এখন গ্রাফিক্সের কাজ করে। খুব ব্রাইট। তার সাথে বুলবুলের যোগাযোগ আছে, তার কাছে তুমি ঠিকানটা পাবে—"

টুম্পা তখনও কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে রিসিভারটা কানে ধরে রাখে। শামীম আহমেদ বললেন, "হ্যালো।"

"জি।"

"তুমি শুনছো?"

"জি শুনছি। আমাকে শুভ চৌধুরীর টেলিফোন নম্বরটি দেবেন।"

"শুভ চৌধুরীর কোনো টেলিফোন নাই। সে টেলিফোন রাখে না। আমি তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি, তুমি তার সাথে দেখা করো। কাল দুপুরে অফিসে থাকবে। আমাকে বলেছে।"

"জি করব।"

শামীম আহমেদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "শোনো টুম্পা, মাঝখানে অনেকদিন পার হয়ে গেছে, তোমার মনে তোমার বাবার কীরকম ছবি আছে আমি জানি না। কিন্তু খুব বেশি কিছু আশা করো না।"

টুম্পা নিঃশ্বাস আটকে রেকে বলল, "করব না।"

"নাও, ঠিকানাটা লিখো।"

টুম্পা ঠিকানাটা লিখলো।

যখন আবার ডাইনিং টেবিলে ফিরে এল তখন সবাই নিঃশব্দে টুম্পার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আছে। ছোট খালা নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে ছিল?"

"আর্টিস্ট শামীম আহমেদ।"

"ও।" একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলল?"

"আমাকে আরেকজনের ঠিকানা দিয়েছেন। পত্রিকার স্টাফ আর্টিস্ট। নাম শুভ চৌধুরী।"

"ও!"

টুম্পা নিচু গলায় বলল, "শুভ চৌধুরী আমার আব্বুর ঠিকানা জানেন।"

কেউ কোনো কথা বলল না, টুম্পা ফিস ফিস করে বলল, "আমার আব্বু বেঁচে আছেন।" তারপর অনেক কষ্ট করেও নিজেকে শান্ত রাখতে পারল না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ছোট খালা কয়েকবার কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঠিক কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তাই চুপ করে রইলেন।

শুভ চৌধুরী চেয়ারে হেলান দিয়ে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন। টুম্পা একটু অস্বস্তি অনুভব করে, শুভ চৌধুরীর মাথায় বড় বড় চুল পেছনে ঝুঁটির মতো করে বাঁধা। মুখে বড় বড় গোঁফ দাড়ি, চুলগুলো কুচকুচে কালো হলেও গোঁফ এবং দাড়ি আধা পাকা। শুভ চৌধুরী হাত দিয়ে তার গোঁফের উপর হাত বুলিয়ে বললেন, "তুমি বুলবুলের মেয়ে?"

টুম্পা মাথা নাড়ল। শুভ চৌধুরী ছোট খালার দিকে তাকালেন, "আপনি?"

"আমি টুম্পার খালা"

"থ্যাংক গড। আপনি টুম্পার মা হলে সমস্যা ছিল।"

"কী সমস্যা?"

শুভ চৌধুরী কোনো উত্তর না দিয়ে আবার টুম্পার দিকে তাকালেন, বললেন, "তুমি সত্যি তোমার বাবার সাথে দেখা করতে চাও?"

টুম্পা মাথা নাড়ল। শুভ চৌধুরী বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই জান তোমার বাবার অবস্থা স্বাভাবিক নয়।"

"জি জানি।"

"তোমার সাথে দেখা করতে চাইবে কী না আমি জানি না। বুলবুল কারো সাথে দেখা করে না।"

"আমি চেষ্টা করব। আমার আব্বু—নিশ্চয়ই আমার সাথে দেখা করবেন।"

"তোমার আব্বু তোমাকে গত দশ বারো বছর দেখে নি। এতো দিনে সে একধরনের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ করে তোমার সাথে দেখা হলে তার লাইফে কিন্তু বিশাল একটা ওলটপালট হয়ে যাবে। সে যেরকম অবস্থায় আছে সেই ওলটপালট তার জন্যে ভালো হবে কী না আমি জানি না।"

টুম্পা কোনো কথা বলল না। শুভ চৌধুরী বললেন, "তুমি কয়দিনের জন্যে এসেছ আবার চলে যাবে। তোমার বাবা এখানে থাকবে। তুমি আমাকে আগে বল, তোমার বাবার জীবনটা ওলটপালট করে চলে যেতে চাও কী না? যেরকম আছে সেভাবে থাকাটাই কী ভালো না?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি আমার বাবাকে দেখতে চাই।"

"শুধু দেখবে? দূর থেকে দেখবে?"

"না। আমি কাছে থেকে দেখব। কথা বলব—"

শুভ চৌধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন, "তুমি মনে মনে ঠিক কী কল্পনা করছ আমি জানি না, তোমার বাবা কিন্তু স্বাভাবিক না। সত্যি কথা বলতে খুব অসুস্থ—"

"আমি তবু দেখতে চাই।"

"ঠিক আছে।" হঠাৎ করে শুভ চৌধুরী চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, "তুমি কখন দেখা করতে চাও?"

"আজকেই। এখনই। আমাকে ঠিকানাটা দেন।"

শুভ চৌধুরী হাসার মতো একটা ভঙ্গী করলেন, বললেন, "তোমাকে ঠিকানা দিয়ে লাভ নেই। তুমি বাসাতে ঢুকতেই পারবে না। বুলবুল দরজাই খুলবে না!"

"আপনি আমাকে ঠিকানা দেন, আমি চেষ্টা করব।"

"কোনো লাভ হবে না। তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে। বুলবুল আমাকে ছাড়া আর কাউকে বাসায় ঢুকতে দেয় না।"

"ঠিক আছে।" টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "তাহলে আপনি যখন বলবেন আমি তখনই যাব।"

শুভ চৌধুরী টেবিলে আঙুল দিয়ে খানিকক্ষণ ঠোকা দিয়ে বললেন, "আমার একটা কাজ শেষ করতে হবে, আধা ঘণ্টার মতো লাগবে। তোমরা যদি আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করো তাহলে আমরা আজকেই যেতে পারি।"

টুম্পা ছোট খালার দিকে তাকালো, ছোট খালা মাথা নাড়লেন। টুম্পা শুভ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা অপেক্ষা করছি।"

আধা ঘণ্টা পর খবরের কাগজের অফিসের সামনে থেকে শুভ চৌধুরী একটা হলুদ ক্যাব নিলেন। টুম্পা আর ছোট খালা বসলেন পিছনে, শুভ চৌধুরী বসলেন ড্রাইভারের পাশে। রাস্তায় অনেক ভীড়, মাঝে মাঝেই ক্যাবটা তার মাঝে পুরোপুরি থেমে যাচ্ছিল। অন্য কোনো দিন হলে টুম্পা চারপাশে দেখতো, প্রত্যেকটা গাড়ি, প্রত্যেকটা স্কুটার, প্রত্যেকটা মানুষের মুখের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করতো, কিন্তু আজকে কোনো কিছুতে সে মন দিতে পারছে না। ছোট খালা শুভ চৌধুরীর সাথে কথা বলছিলেন, ভাসা ভাসা ভাবে সেটা সে শুনতে পাচ্ছিল। যখন ভালো ছিলেন তখন খুব বড় বড় কাজ করেছিলেন, অনেক ছবি এঁকেছেন বিক্রি করেছেন, বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির এডভাইজার ছিলেন—তারা তাকে ফেলে দেয় নি। ব্যাংকে সেফ ডিপোজিটে টাকা আছে মাসিক ভাতা পান, তা দিয়ে তার আব্বুর দিন চলে যায়। তার বড় একটা কারণ যে আব্বুর কোনো খরচ নাই, দিনের পর দিন আব্বু ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। টুম্পা চিন্তাও করতে পারে না, এটা কী ভয়ংকর একটা জীবন!

হলুদ রঙের ক্যাবটা শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদপুরের একটা গলির ভেতর দিয়ে গিয়ে ছোট একটা দোতালা বাসার সামনে দাঁড়ালো। শুভ চৌধুরী ক্যাব থেকে নেমে বললেন, "এই যে এই বাসা। বুলবুল দোতালায় থাকে।"

টুম্পার বুক ধ্বক ধ্বক করতে থাকে, তার মনে হয় সেই শব্দ বুঝি সবাই শুনতে পাচ্ছে। সে ছোট খালার হাত ধরে ফিস ফিস করে বলল, "ছোট খালা আমার খুব ভয় করছে।"

"ভয় কী টুম্পা।" ছোট খালা নরম গলায় বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। আয় আমার সাথে।"

শুভ চৌধুরীর পিছু পিছু টুম্পা আর ছোট খালা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। সিঁড়ির সামনে একটা ভারী দরজা, শুভ চৌধুরী দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, "বুলবুল।"

ভেতরে কিছু একটা শব্দ হচ্ছিল, শব্দটা হঠাৎ থেমে গেলো। শুভ চৌধুরী আবার ডাকলেন, "বুলবুল।"

ভেতর থেকে টুম্পা ভারী গলায় একজনের কথা শুনতে পেল, "কে?" এটা তার আব্বুর গলার স্বর? টুম্পা আরো জোরে তার ছোট খালার হাত আঁকড়ে ধরলো।

শুভ চৌধুরী বললেন, "আমি শুভ।"

"শুভ?"

"হ্যাঁ। দরজা খোলো বুলবুল।"

খুট করে দরজা খুলে গেল। দরজার সামনে পর্দা, পর্দার ভেতর থেকে একটা শুকনো ফর্সা হাত বের হয়ে এল। হাতটা শুভকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে বলল, "দাও।"

"আমি তোমার জন্যে কিছু আনি নি—দেখা করতে এসেছি।"

সাথে সাথে ফর্সা হাতটা ভেতরে ঢুকে সশব্দে দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেল। শুভ চৌধুরী টুম্পার দিকে তাকিয়ে দুর্বল ভাবে হাসলেন। আবার দরজায় শব্দ করে বললেন, "দরজা খোলো বুলবুল। তোমার সাথে একজন দেখা করতে এসেছে?"

ভেতরে দীর্ঘসময় কোনো শব্দ নেই, তারপর একটা ভয়ার্ত গলা শোনা গেল, "কে?"

"দরজা খুললেই তুমি দেখবে।"

"না আমি দেখতে চাই না। তুমি চলে যেতে বলো।"

"তুমি আগে দরজা খুলে দেখো।"

"না।" ভেতর থেকে প্রায় আর্ত চিৎকারের মতো শব্দ হলো, "না। আমি দেখতে চাই না। তুমি চলে যেতে বল—চলে যেতে বল!"

শুভ চৌধুরী বললেন, "ছিঃ বুলবুল, ছিঃ! এভাবে চিৎকার করে না। তুমি দরজা খোলো—দরজা খুললেই দেখবে তোমার মেয়ে দেখা করতে এসেছে।"

"কে?"

"তোমার মেয়ে।"

প্রায় চিৎকার করে ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলো, "কে?"

"বলেছিতো, তোমার মেয়ে টুম্পা।"

"মিথ্যা কথা বলবে না শুভ। খবরদার তুমি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলবে না। খবরদার শুভ—খবরদার—"

"তুমি দরজা খোলো তাহলেই দেখবে। আমি মিথ্যা বলছি না। তোমার মেয়ে টুম্পা এসেছে।"

"টুম্পা?"

"হ্যাঁ টুম্পা।"

"টুম্পা?"

"হ্যাঁ বললাম তো, টুম্পা।"

"তুমি মিথ্যা কথা বল না শুভ, টুম্পাকে ওরা আমেরিকা নিয়ে গেছে, আমি জানি।"

"আমেরিকা থেকে টুম্পা এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে। তুমি দরজা খুললেই দেখবে।"

"এতো ছোট টুম্পা কেমন করে আমেরিকা থেকে আসবে?"

শুভ চৌধুরী হাসার মতো শব্দ করে বললেন, "টুম্পা এখন আরো ছোট নেই বুলবুল। টুম্পা এখন বড় হয়েছে। দরজা খুললেই দেখবে।

"না না না।" ভেতরে হঠাৎ আর্ত চিৎকারের মতো শব্দ হতে থাকে," আমি দেখব না। দেখব না। চলে যাওয়া তোমরা চলে যাও। চলে যাও।"

হঠাৎ করে ভেতরে ঝন ঝন করে কী একটা যেন ভেঙে পড়লো। শুভ চৌধুরী টুম্পার দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আজকে মনে হয় হবে না।"

"আমি একটু কথা বলি?"

"আমার মনে হয় এখন না বলাই ভালো।"

"আমার আব্বুর সাথে আমি দেখা করতে পারব না?"

শুভ চৌধুরী ইতস্তত করে বললেন, "দেখতেই পাচ্ছ কাজটা কঠিন। অনেক কঠিন। আমরা চেষ্টা করব। ঠিক আছে?" শুভ চৌধুরী টুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তুমি মন খারাপ করো না টুম্পা।"

ইয়েলো ক্যাবে টুম্পা নিঃশব্দে ছোটখালার কাছে বসে ছিল। শুভ চৌধুরী তার নিজের মতো করে চলে গেছেন, ছোট খালা টুম্পাকে নিয়ে বাসায় ফিরছেন। ক্যাবটি আসাদগেটের কাছে আসতেই টুম্পা বলল, "ড্রাইভার ক্যাবটা ঘোরান।"

ক্যাব ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, "ঘোরাবো?"

"হ্যাঁ, কোথায় ঘোরাব?"

"যেখান থেকে এসেছেন সেখানে আমাকে নামিয়ে দেন।"

ছোট খালা অবাক হয়ে বললেন, "কী বললি টুম্পা?"

"হ্যাঁ ছোট খালা আমি যাব।" টুম্পা ছোট খালার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাও। আমি আমার আব্বুর সাথে দেখা না করে যাব না।"

"কিন্তু—"

"কোনো কিন্তু নেই ছোট খালা।" টুম্পা তার ছোট খালার দিকে তাকিয়ে হাসলো, "আমার আব্বু আমার সাথে দেখা করবে না এটা কী হতে পারে?

পরিচয়

টুম্পা খুব নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে খুটখুট করে কিছু একটা শব্দ হচ্ছে, কিসের শব্দ কে জানে। টুম্পা বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে দরজায় ঠোকা দিলো, সাথে সাথে ভেতরের খুট খুট শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, ভয় পাওয়া গলায় তার আব্বু বলল, "কে?"

টুম্পা বলল, "আমি আব্বু। আমি টুম্পা।"

"টুম্পা?" আব্বুর গলায় অবিশ্বাস, "টুম্পা কে?"

"আমি তোমার মেয়ে আব্বু।"

"মিথ্যা কথা।" আব্বু চিৎকার করে উঠলেন, "সব মিথ্যা।"

"না আব্বু—" টুম্পাও গলা উচিয়ে বলল, "মিথ্যা না। সত্যি।"

"আমি জানি টুম্পাকে নিয়ে গেছে—"

"হ্যাঁ আব্বু। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি এখন এসেছি। তুমি দরজা খোলো তাহলে তুমি দেখবে।"

"না।"

"প্লিজ আব্বু-তুমি দরজা খোলো।"

"না। তুমি চলে যাও।"

টুম্পা কাতর গলায় বলল, "কেন আমি চলে যাব?"

আব্বু ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "আমি জানি তুমি কেন এসেছ। আমি সব জানি।"

"তুমি কী জান?"

আব্বু দরজার কাছে এসে ফিস ফিস করে বললেন, "আমি জানি তোমাকে ওরা পাঠিয়েছে।"

"কারা?"

"যারা আমাকে মারতে চায়!"

"কে তোমাকে মারতে চায়?"

আব্বু গম্ভীর গলায় মাথা নাড়লেন, বললেন, "আছে একজন।"

টুম্পা নরম গলায় বলল, "আব্বু আমি তোমার কাছে বসে থাকব, আমি কাউকে তোমার কাছে আসতে দেব না! তুমি একবার দরজা খুলে আমাকে দেখো, তোমার যদি ইচ্ছে না হয় তাহলে আমাকে ঢুকতে দিও না।"

ঘরের ভেতর থেকে আব্বু কোনো শব্দ করলেন না। টুম্পা নরম গলায় বলল, "তুমি না চাইলে আমি ভিতরে ঢুকব না। আব্বু। বিশ্বাস কর।"

এবারেও ভেতর থেকে কোনো শব্দ এল না। টুম্পা বলল, "তুমি শুধু একবার দরজা একটু খোলো, আমি তোমাকে শুধু একটু দেখতে চাই। তুমি আমার আব্বু, আমি তোমাকে কোনোদিন দেখি নাই।"

ঘরের ভেতরে খস খস করে একটু শব্দ হলো। টুম্পা বলল, "দরজা খুলো আব্বু, তুমি কি একবার তোমার মেয়েকে দেখতে চাও না?"

ভেতর থেকে আব্বু বললেন, "তুমি আমার মেয়ে না।"

"আমি তোমার মেয়ে। দরজা খোলো তাহলে দেখবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি ভিতরে ঢুকব না।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"তাহলে তুমি দূরে দাঁড়িয়ে থেকো।"

টুম্পা কয়েক পা পিছনে সরে গিয়ে বলল, "এই দেখো আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি।"

খুট করে দরজায় শব্দ হলো। তারপর খুব ধীরে ধীরে দরজাটা একটু খুলে যায়। সেখানে একটা মুখ উঁকি দেয়, ভীত, সন্ত্রস্ত একটা মুখ। মাথা ভরা এলোমেলো চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রং ফর্সা, চোখের নিচে কালি। টুম্পা হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকে, এই মানুষটি তার আব্বু? তার এখনও বিশ্বাস হয় না সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

আব্বু তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ফিস ফিস করে বললেন, "তুমি টুম্পা না। আমার টুম্পা অনেক ছোট।"

"আমিও ছোট ছিলাম আব্বু। আমি অনেক বড় হয়েছি।"

আব্বু দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন, টুম্পা অনুনয় করে বলল, "আব্বু তুমি দরজাটা বন্ধ করো না, প্লিজ। আমি ভেতরে ঢুকবো না। এই দেখো আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।"

আব্বু দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেলেন, আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফিস ফিস করে বললেন, "তুমি কেন এসেছ?"

"তোমাকে দেখতে।"

"আমাকে দেখেছ। এখন চলে যাও।"

"আমি আরো দেখতে চাই।" টুম্পা অনুনয় করে বলল, আমি এখানে বসি?"

আব্বু কোনো কথা বললেন না। টুম্পা নিজেই তখন সিঁড়ির উপর বসে গেলো। নরম গলায় বলল, "এই দেখো আমি ভিতরে ঢুকছি না।"

আব্বু এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন। টুম্পা বলল, "আব্বু। তুমি একটা চেয়ার নিয়ে বস।"

"কেন?"

"আমরা দুইজন একটু গল্প করি।"

আব্বু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর সত্যি সত্যি একটা চেয়ার টেনে এনে দরজায় বসলেন। টুম্পা তার আব্বুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আব্বু, তুমি ভালো আছ?"

আব্বু কোনো কথা বললেন না। টুম্পা আবার জিজ্ঞেস করল, "ভালো আছ তুমি?"

আব্বু মাথা ঝাঁকালেন, বোঝালেন ভালো নেই।

"কেন তুমি ভালো নেই, আব্বু?"

"ঘুমাতে পারি না তো তাই।"

"কেন তুমি ঘুমাতে পার না?"

"সব সময় আমাকে খুব সাবধান থাকতে হয় তো সেইজন্যে।" একটু থেমে যোগ করলেন, "কেউ যদি চলে আসে।"

টুম্পা অবাক হয়ে তার আব্বুর দিকে তাকিয়ে রইলো। আহা! এই মানুষটি কোনো কারণ ছাড়া শুধু শুধু কী ভয়ানক একটা আতংকে থাকেন? টুম্পা নরম গলায় বলল, "আব্বু।"

আব্বু কোনো কথা না বলে তার দিকে তাকালেন। টুম্পা বলল, "আব্বু,

তুমি এখন একটু ঘুমাতে চাও?"

"কেন?"

"আমি বসে বসে পাহারা দেব, যেন কেউ না আসতে পারে।"

আব্বু অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকালেন, "পাহারা দেবে? তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমি তোমার মেয়ে, সেজন্যে। মেয়েরা সবসময় তাদের আব্বুদের কাছে থাকে। তাদের আব্বুদের পাহারা দেয়।"

আব্বু অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "তুমি সত্যিই আমার মেয়ে?"

"হ্যাঁ আব্বু। তুমি দেখতে চাও?"

"কীভাবে দেখব?"

"আমাকে একটা কাগজ দাও। তোমাকে দেখাই—"

"কাগজ? কাগজ?" আব্বুকে কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখা গেল।

"দাঁড়াও, আমার কাছেই কাগজ আছে।" টুম্পা তার ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তার কোলের উপর রেখে হাতে একটা কলম নেয়, বলে, "আব্বু, তুমি নড়বে না।"

আব্বু অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকালেন, টুম্পা কাগজে কলম দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলো—দুই মিনিটের মাঝে ছবিটা শেষ করে সে উঠে দাঁড়ায়, একটু এগিয়ে গিয়ে তার আব্বুর হাতে কাগজটা দিয়ে বলল, "এই দেখো।"

কাগজটা হাতে নিতেই তার আব্বুর মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো, টুম্পা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে! হাসিটি কী সুন্দর, একেবারে ছোট বাচ্চার মতো। এই প্রথম সে তার আব্বুকে হাসতে দেখলো, আব্বু মুখে হাসিটা ধরে রেখে বললেন, "কী সুন্দর! এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমার ছবি এঁকেছ!"

"হ্যাঁ আব্বু।

"স্ট্রোকগুলো কী পাওয়ারফুল। মাই গড।"

"আমি কেমন করে এঁকেছি জান?"

"কেমন করে?"

"কারণ আমি তোমার মেয়ে সেজন্যে! আমি এটা তোমার কাছ থেকে পেয়েছি।"

আব্বু কেমন যেন অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকালেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "তার মানে, তার মানে তুমি—তুমি মানে তুই তুই আসলেই আমার মেয়ে?"

"হ্যাঁ আব্বু।"

"তুই একটু কাছে আয়—" বলে আব্বু উঠে দাঁড়ালেন।

টুম্পা একটু এগিয়ে গেল, আব্বু খুব সাবধানে টুম্পার হাত একটু স্পর্শ করলেন, তারপর তার মাথায় হাত বুলালেন, তারপর তার থুতনিটা ধরে তার মুখটা উঁচু করে সেদিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, "তোকে যখন শেষবার দেখেছি তখন তুই এই এতোটুকু ছিলি।"

"আমার মনে নেই।"

"কীভাবে মনে থাকবে? তুই তখন মাত্র এইটুকুন।" আব্বু খুব সাবধানে টুম্পার মাথায় পিঠে হাত রাখলেন, তাকে দেখে মনে হতে লাগলো একটু জোরে স্পর্শ করলেই টুম্পা বুঝি টুকটুক করে ভেঙে যাবে।" টুম্পা ফিস ফিস করে বলল, "আব্বু।"

"কী মা?"

"আমি তোমাকে একটু ধরি?"

"ধরবি? ধর।"

টুম্পা তার আব্বুকে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো। আব্বু কেমন জানি ভয় পেয়ে গেলেন, টুম্পাকে টেনে সরিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, "কী হয়েছে টুম্পা? কী হয়েছে?"

টুম্পা চোখ মুছে বলল, "কিছু হয় নি আব্বু। কিছু হয় নি।"

"পেট ব্যথা করছে?"

টুম্পা হেসে ফেলল, "না আব্বু।"

"খিদে লেগেছে?"

"না আব্বু খিদে লাগে নাই।"

"তাহলে তুই কাঁদছিস কেন?"

"আমি আর কাঁদছি না আব্বু। এই দেখো—" টুম্পা তার চোখ মুছে হাসার চেষ্টা করল।

আব্বু বললেন, "হ্যাঁ। কাঁদিস না।"

টুম্পা বলল, "আব্বু, আমাকে ভেতরে আসতে দেবে না?"

"হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি ভেতরে আয়। এই দরজাটা বন্ধ করে দিই। পরে আমাদের দেখে ফেলবে।"

" কে দেখে ফেলবে?"

"বলেছি না?" আব্বু গলা নামিয়ে বললেন, "সি.আই.এ।"

টুম্পা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এটাকেই নিশ্চয়ই স্কিৎজোফ্রেনিয়া বলে। অবাস্তব একটা জিনিস নিয়ে ভয়। যে জিনিসটাকে নিয়ে ভয় সেটা অবাস্তব হতে পারে কিন্তু ভয়টা পুরোপুরি বাস্তব। আব্বুর মুখ দেখে সেটা বোঝা যায়।

টুম্পা আব্বুর পিছু পিছু ঘরে ঢুকলো। ঘরের সবগুলো জানালার পর্দা টেনে রাখা আছে। দিনের বেলাতেই ঘর অন্ধকার, মাথার ওপর একটা লাইট মিট মিট করে জ্বলছে। ঘরের দেওয়ালে পেন্সিল দিয়ে আঁকা বিচিত্র ছবি। ঘরে আসবাবপত্র বলে কিছু নেই, একটা খাটে অগোছালো বিছানা। এক কোণায় স্তূপ করে রাখা ময়লা কাপড়। একটা টেবিলের উপর কয়েকটা প্লেট আর বাটি সেখানে কিছু অভুক্ত খাবার।

আব্বু একটা জানালার কাছে গিয়ে পর্দা একটুকু সরিয়ে খুব সাবধানে বাইরে তাকালেন। মনে হলো খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখছেন। টুম্পা আব্বুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী দেখো আব্বু?"

আব্বু ফিসফিস করে বললেন, "মানুষগুলো ঐখানে থাকে।"

"কোন মানুষগুলি?"

"সি.আই.এর মানুষগুলো। চুপি চুপি চলে আসতে চায়।" আব্বুর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, "সেইজন্যে সাবধানে থাকতে হয়। ঘুমাতে পারি না।"

আব্বুর জন্যে টুম্পার এতো মায়া হলো সেটা বলার মতো না। আব্বুর হাত ধরে বলল, "আব্বু তুমি এখন ঘুমাও। আমি পাহারা দিব যেন কেউ আসতে না পারে।"

"তুই পারবি না।"

" কেন পারব না?"

"ওরা খুব ডেঞ্জারাস, ওদের কাছে কতো কী থাকে তুই জানিস?"

"থাকলে থাকুক। আমি ওদেরকে কাছেই আসতে দিব না।"

"কীভাবে কাছে আসতে দিবি না?"

"আব্বু, আমি আমেরিকা থাকি তুমি ভুলে গেছো? ইংরেজিতে আমি এমন বকা দেব যে, পালাবার রাস্তা পাবে না!"

আব্বু অবাক হয়ে বললেন, "বকা দিবি? ইংরেজিতে বকা দিবি?"

"হ্যাঁ।"

"না, না, সর্বনাশ—ওরা খুব ডেঞ্জারাস। ওরা যদি টের পায় তুই আমার মেয়ে তাহলে তোরও অনেক বড় বিপদ হবে!" আব্বুকে খুব দুশ্চিন্তিত দেখালো।

টুম্পা অসহায় বোধ করে। তার আব্বুর সাথে এরকম একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে তার কেমন যেন লজ্জা করে! নিজেকে কেমন যেন প্রতারক মনে হয়। তবু সে চেষ্টা করল, বলল, "ঠিক আছে আব্বু, তাহলে আমি ওদেরকে কিছু বলব না।"

"সেটাই ভালো। দরজাও খুলবি না।"

"দরজা খুলব না।"

"যদি আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করে—"

"তাহলে বলব তুমি এখানে থাকো না।"

আব্বুর কাছে কথাটা পছন্দ হলো। বললেন, "হ্যাঁ সেটাই ভালো।"

টুম্পা তার আব্বুকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে বলল, "তুমি এখন একটু ঘুমাও। আস। তোমার ঘুমানো খুব দরকার।"

আব্বু টুম্পার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "তুমি হাস কেন আব্বু?"

"তুই দেখি ডাক্তারের মতো কথা বলিস। সেও খালি বলে আপনি ঘুমাবেন। বেশি করে ঘুমাবেন।"

"তোমার ডাক্তারের নাম কী আব্বু?"

"জানি না। শুভ নিয়ে আসে। আমি ঢুকতে দিতে চাই না।"

"কেন ঢুকতে দিতে চাও না।"

"বলা তো যায় না—যদি সি.আই.এর লোক হয়।"

টুম্পা বলল, "ও!"

আব্বু বললেন, "খুব বিপদের মাঝে থাকি।"

"তুমি নিজে ডাক্তারের কাছে যাও না?"

আব্বু ভয়ের ভঙ্গী করলেন, বললেন, "সর্বনাশ! যদি দেখে ফেলে?"

টুম্পা বলল, "কারা দেখে ফেলে?"

আব্বু বললেন, "কারা আবার? সি.আই.এ।"

টুম্পা বলল, "ও!" তারপর তার আব্বুর হাত ধরে তাকে বিছানার কাছে নিয়ে শুইয়ে দিয়ে বলল, "তুমি এখন একটু ঘুমাও। কোনো চিন্তা না করে ঘুমাও। আমি এইখানে বসে থাকব।"

"আমাকে না বলে চলে যাবি না তো?"

"না আব্বু। চলে যাব না।"

টুম্পা তার আব্বুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, "তুমি চোখ বন্ধ কর। ঘুমাও।"

আব্বু চোখ বন্ধ করলেন তারপর সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে গেলেন। টুম্পা তার আব্বুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মানুষটা কী সুদর্শন, চেহারাটা একেবারে শিশুর মতো! টুম্পার এখনো বিশ্বাস হয় না সে তার নিজের বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে!

আব্বু যতক্ষণ ঘুমালেন টুম্পা ততক্ষণ একটুও নড়লো না। আব্বুর ঘুমটা প্রথম দিকে ছিল একটু অস্থির, শুয়ে একটু ছটফট করলেন তারপর এক সময় শান্ত হয়ে ঘুমালেন। ঘণ্টা দুয়েক পর আবার ছটফট করলেন, এক সময় চোখ খুলে তাকালেন কিছু দেখলেন বলে মনে হলো না। বিড় বিড় করে কিছু একটা বললেন তারপর আবার ঘুমিয়ে গেলেন। ঘণ্টা দুয়েক পর যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন চোখ খুলে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন, চোখের দৃষ্টিটা একটু অন্যরকম! টুম্পা ভয়ে ভয়ে ডাকলো, "আব্বু।"

আব্বু উঠে বসে হাত দিয়ে টুম্পাকে স্পর্শ করলেন, মনে হলো যেন পরীক্ষা করে দেখছেন টুম্পা কী সত্যিই আছে নাকি মিথ্যে। টুম্পা আবার ডাকলো, "আব্বু।"

আব্বু দুর্বলভাবে হাসলেন, বললেন, "কোনটা যে স্বপ্ন আর কোনটা যে সত্যি বুঝতে পারি না। আমি ভাবছিলাম তুই বুঝি স্বপ্ন।"

"না আব্বু। আমি স্বপ্ন না। আমি সত্যি।"

"হ্যাঁ তুই সত্যি।"

আব্বু বিছানায় পা তুলে গুটিশুটি মেরে বসে রইলেন। টুম্পা বলল, "আব্বু তুমি হাত মুখ ধোবে না?"

"হাত মুখ? ধুয়েছিলাম তো।"

"ঘুম থেকে উঠে আরেকবার ধুলে ভালো লাগবে।" টুম্পা আব্বুকে ঠেলে বিছানা থেকে নামালো। বলল, "যাও, গোসল করে ফেলো, যা গরম।"

"কে বলেছে গরম?"

"আমি তো আমেরিকা এসেছি। আমার অনেক গরম লাগে।"

"আমার গরম লাগে না।"

"আমি তোমার বাসাটা দেখি একটু।"

"দেখবি?" আব্বু কেমন সন্দেহের চোখে তাকালেন, "কেন দেখবি?"

"এমনি। তুমি কেমন আছ আমার দেখার ইচ্ছা করে না?"

" দেখ তাহলে।"

টুম্পা তখন বাসাটা ঘুরে দেখলো। দুইটা রুম, একটা বাথরুম আরেকটা রান্নাঘর। রান্নাঘরে চুলার উপর একটা তোবড়ানো কেতলি। কিছু নোংরা বাসন। হতশ্রী বাথরুম—একটা প্লাস্টিকের বালতি কাৎ হয়ে পড়ে আছে। একটা শুকনো টুথপেস্টের টিউব আর পুরানো একটা টুথব্রাশ ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের মাঝে ইতস্তত বই ছড়ানো। কিছু বাংলা কিছু ইংরেজি। বইগুলোর কোনো মাথামুণ্ডু নেই, কোনোটা কবিতা, কোনোটা ধর্ম, আবার কোনোটা শিল্প ইতিহাস। টুম্পা তার জীবনে এরকম একটা হতচ্ছাড়া বাসা দেখে নি। তার আব্বু কীভাবে দিনের পর দিন এরকম একটা জায়গায় থাকেন, ব্যাপারটা চিন্তা করেই টুম্পার চোখে পানি চলে আসে।

টুম্পা যখন বাইরের ঘরে ফিরে এসেছে তখনো তার আব্বু বিছানায় গুটিশুটি মেরে বসে আছেন। টুম্পা বলল, "আব্বু! তোমার বাসার অবস্থা খুব খারাপ।"

আব্বু চমকে উঠলেন, ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "কেন? কেন? কী হয়েছে?"

"না আব্বু কিছু হয় নাই। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই! তোমার বাসাটা মনে হয় কোনোদিন পরিষ্কার করা হয় নাই। জঘন্য অবস্থা।"

আব্বু এদিক-সেদিক তাকালেন, বললেন, "আমার কাছে ভালোই তো লাগছে।"

"না। এইটা ভালো না।" টুম্পা মুখ গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করল, "আব্বু তুমি কী খাও?"

"রাত্রি বেলা একজন খাবার দিয়ে যায়। সেইটা খাই।"

"নাস্তা?"

"নাস্তা করতে হয় না।"

"দুপুরে কী খাও?"

আব্বু মাথা চুলকে বললেন, "যখন যেটা থাকে তখন সেটা খাই। না থাকলে খাই না।"

টুম্পা মাথা নাড়লো, বলল, "এইটা ঠিক না আব্বু। একেবারে ঠিক না।"

আব্বু কোনো কথা বললেন না, একটু হাসার চেষ্টা করলেন। ঠিক এরকম সময় দরজায় ঠুকঠুক করে শব্দ হলো—আব্বু ভীষণ চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "সর্বনাশ! কে এসেছে? কে?"

টুম্পা হাতের ঘড়িটা দেখে বলল, "ছোট খালা আমাকে নিতে এসেছেন।"

"কেন? কেন এখানে এসেছে? কীভাবে এসেছে?"

টুম্পা আব্বুর হাত ধরে বলল, "আব্বু তুমি শান্ত হও। তুমি এত ভয় পেলে হবে কেমন করে? আমি ছোটখালাকে বলেছি ঠিক ছয়টার সময় আমাকে নিয়ে আসতে। এই দেখো ছয়টা বাজে—"

আব্বু তবুও ফ্যাকাসে মুখে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন। টুম্পা বলল, "আব্বু আমি আজকে যাই?"

আব্বু, বিড় বিড় করে কী একটা বললেন ঠিক বোঝা গেল না। টুম্পা বলল, "কাল সকালে আসব। ঠিক আছে আব্বু?"

আব্বু আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। টুম্পা আব্বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কাল সকালে আমার কথা মনে থাকবে তো?"

"মনে থাকবে।"

টুম্পা দরজা খুলে বের হতেই আব্বু দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ছোটখালার সাথে ফিরে যাবার সময় টুম্পা দেখলো জানালার পর্দা অল্প একটু সরিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে আব্বু তাকিয়ে আছেন।

ছবি

টুম্পা দরজায় ঠোকা দিয়ে ডাকলো, "আব্বু।"

সাথে সাথে খুট করে দরজা খুলে আব্বু মাথা বের করলেন। একটু অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন, দেখে মনে হতে লাগলো যেন টুম্পাকে চিনতে পারছেন না। টুম্পা জিজ্ঞেস করলো, "কী হয়েছে আব্বু?"

"না!" আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "মাথার মাঝে সব গোলমাল হয়ে যায়। তুই কি স্বপ্ন না সত্যি মনে থাকে না।"

"আমি সত্যি আব্বু। পুরোপুরি সত্যি।" টুম্পার হাতে অনেকগুলো প্যাকেট, সেগুলো ভেতরে রেখে বলল, "আব্বু, তুমি দরজাটা আগেই বন্ধ করো না।"

"কেন?"

"আমি আরও জিনিস এনেছি, সেগুলো নিয়ে আসি।"

"কী জিনিস?"

"আনলেই দেখবে।"

আব্বু এক ধরনের শংকিত মুখে তাকিয়ে রইলেন, টুম্পা তার মাঝে নিচে থেকে বাকি জিনিসগুলো নিয়ে এল। ছোটখালা নিচে দাঁড়িয়েছিলেন, টুম্পা ফিস ফিস করে বললো, "তুমি সন্ধ্যেবেলা এসো ছোটখালা। এখন যাও।"

ছোটখালা হাত নেড়ে চলে গেলেন। টুম্পা সব জিনিসপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, "তুমি এখন দরজাটা বন্ধ করে দিতে পার।"

আব্বু দরজা বন্ধ করে দিয়ে টুম্পার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "এগুলো কী?"

"আজকে হচ্ছে ঘরবাড়ি পরিষ্কার দিবস।"

"ঘরবাড়ি পরিষ্কার?"

"হ্যাঁ, প্রথমে আমি তোমার বাথরুমটা পরিষ্কার করে দেব। তারপর তুমি বাথরুমে ঢুকে আচ্ছামতন গোসল করবে। তোমার এতো সুন্দর চুলগুলি আঠা আঠা হয়ে আছে। ওগুলো শ্যাম্পু দিয়ে ধোবে। তারপর শেভ করবে। তারপর নতুন কাপড় পরবে—"

"নতুন কাপড়? নতুন কাপড় কোথায় পাব?"

"আমি নিয়ে এসেছি। সেই জন্যেই তো আসতে দেরি হলো।"

আব্বু কেমন যেন অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন। টুম্পা হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে সেটা খুলে কয়েকটা বই বের করে আব্বুর হাতে ধরিয়ে দিল। বলল, "তুমি বসে বসে এই বইয়ের ছবি দেখো, আমি বাথরুমটা ধুয়ে আসি।"

আব্বু খানিকটা হতচকিতের মতো বই হাতে বসে রইলেন আর টুম্পা সাবান, ডিটারজেন্ট, ব্রাশ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। বাথরুম ধুয়ে পরিষ্কার করে, বালতিতে পানি ভরে সে আব্বুকে ডাক দিলো, "আব্বু এসো।"

আব্বু উঠে এসে বাথরুমে উঁকি দিলেন, বাথরুম ঝকঝক করছে। বেসিনের তাকে কাচের গ্লাসে নতুন টুথব্রাশ টুথপেস্ট আর রেজর। পাশে শেভিং ক্রিম আর চিরুনী। সাবানদানীতে মোড়ক খোলা সাবান আর শ্যাম্পু। হ্যাঙ্গারে পরিষ্কার তোয়ালে আর পায়জামা পাঞ্জাবি। টুম্পা বলল, "তুমি খুব ভালো করে দলাই মলাই করে গোসল করো। দাড়ি শেভ করো। মাথায় শ্যাম্পু দাও। ঠিক আছে আব্বু?"

আব্বু মাথা নেড়ে বাথরুমে ঢুকলেন। গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বের হয়ে দেখলেন টুম্পা এর মাঝে ঘরটার ভোল পাল্টিয়ে ফেলেছে। ঘর ঝাট দিয়েছে, ময়লা আবর্জনা ময়লার ঝুড়িতে ফেলেছে। বিছানার চাদর বালিশের ওয়ার পাল্টে ফেলেছে। টেবিলের উপর নূতন টেবিল ক্লথ, সেখানে পানির বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট, কিছু ফলমূল। সব ময়লা কাপড় এক জায়গায় জড়ো করে সে বাথরুমে নিয়ে যেতে থাকে।

আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কী করবি?"

"ধুবো। ধুয়ে নেড়ে দেব।"

"তুই কাপড় ধুতে পারিস?"

টুম্পা বলল, "না পারার কী আছে?"

কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল টুম্পা বাথরুমে পিটিয়ে কাপড় ধুতে শুরু করেছে।

কাপড় ধুয়ে সেগুলো শুকোতে দিয়ে টুম্পা নিজেও গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরে বের হলো। আব্বু খানিকটা বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। টুম্পা বলল, "আব্বু আমার খিদে পেয়েছে।"

আব্বু ইতস্তত করে বললেন, "খিদে পেয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে, তাহলে—" কী করবেন বুঝতে না পেরে আব্বু এদিক সেদিক তাকালেন।

"আমি কী ঠিক করেছি জান?"

"কী?"

"এই রাস্তার মোড়ে একটা ফাস্টফুডের দোকান আছে। সেখানে তুমি আর আমি খেতে যাব।"

আব্বুর মুখ দেখে মনে হলো' টুম্পা কী বলছে সেটা যেন বুঝতেই পারেন নি। আস্তে আস্তে বললেন, "ফাস্ট ফুড?"

"হ্যাঁ আব্বু। অনেক মজার মজার খাবার আছে।"

"খাবার?"

"হ্যাঁ। আব্বু, চল যাই।"

আব্বু কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, "তুই কী বলছিস? আমি বাইরে যাব? আমি?"

"হ্যাঁ।"

"তুই জানিস না সি.আই.এ. আমাকে মারার জন্যে ঘুরছে?"

"আব্বু, এটা তোমার কাল্পনিক ভয়।"

"কাল্পনিক?"

"হ্যাঁ। তুমি শুধু শুধু এরকম একটা মিথ্যা ভয় পাও। আসলে কেউ তোমাকে মারার জন্যে ঘুরছে না।"

আব্বু অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকালেন, ধীরে ধীরে কেমন যেন রেগে উঠলেন, ধমক দিয়ে বললেন, "খবরদার। যেটা জানিস না সেটা নিয়ে কথা বলিস না। আমি কী বাচ্চা ছেলে নাকি যে কিছু বুঝি না? তুই জানিস আমি কী বিপদের মাঝে থাকি–"

"আব্বু! কেন সি. আই. এ তোমাকে মারতে আসবে? তুমি কী করেছ?"

"সেটাই তো আমি বোঝার চেষ্টা করি বুঝতে পরি না।"

"টুম্পা অনুনয় করে বলল," আব্বু, আমি তোমকে বলছি, তোমার কিছু হবে না। শুধু একটু বের হব। এই রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার চলে আসব। সি. আই.এ র লোকেরা জানতেও পারবে না।"

আব্বু বললেন, "না।" তারপর ওঠে গিয়ে জানালার পর্দা একটু ফাক করে উদ্বিগ্ন মুখে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

টুম্পা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপচাপ বসে রইল।

ডাক্তার সাহেব চশমার উপর দিয়ে টুম্পার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুমি বুলবুল রায়হানের মেয়ে?"

"জী।"

"আমেরিকা থেকে এসেছ?"

"জী।"

"কতোদিন থাকবে?"

"চার সপ্তাহ।"

"ও।" ডাক্তার সাহেব একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি তো ছোট মেয়ে, তোমাকে ঠিক কী বলব বুঝতে পারছি না। বড় কেউ হলে সুবিধা হতো।"

"আব্বুর ফেমিলিতে বড় কেউ নাই।"

"ও।"

টুম্পা বলল, "আমাকে একটু বলবেন আব্বুর কী সমস্যা। সব সময়ে বলেন সি.আই.এ. তাকে মারতে আসছে। কেন এরকম একটা অসম্ভব জিনিষ বিশ্বাস করেন?"

ডাক্তার সাহেব আঙুল দিয়ে টেবিলে ঠোকা দিতে দিতে বললেন, "তোমার আব্বুর যে ডিজঅর্ডার সেটার নাম স্কিৎজোফ্রেনিয়া। এটাকে বলা যায় সবচেয়ে ভয়ংকর মানসিক ডিজঅর্ডার। কেন এটা হয় এখনো কেউ জানে না। এর মাঝে বায়োলজিকেল কারণ আছে আবার এনভায়রনমেন্টাল কারণ আছে-"

ডাক্তার সাহেব অনেক্ষণ ধরে স্কিৎজোফ্রেনিয়া অসুখটার খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বললেন। টুম্পা তার কিছু বুঝলো কিছু বুঝলো না। ডাক্তার সাহেব যখন

থামলেন তখন টুম্পা জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু আমি কী আব্বুকে বোঝাতে পারি না যে তাকে কেউ মারতে আসছে না। আসলে সব মিথ্যা–"

"আমি কী তোমাকে বোঝাতে পারব যে আমি মিথ্যা? পারব না। কারণ তুমি আমাকে দেখছ। আমার সাথে কথা বলছ। ঠিক সেরকম তোমার আব্বু সে-গুলো দেখেন, তাদের কথা শুনেন। কেমন করে অবিশ্বাস করবেন?"

"তাহলে কী কিছু করার নেই?"

"আজকাল ভালো ভালো ওষুধ বের হয়েছে। তাদের এংজাইটি কমিয়ে আনা যায়, ইফ ইউ আর লাকী তারা প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। ক্রিয়েটিভ কাজ করতে পারে—"

"আব্বু কী আবার ছবি আঁকতে পারবেন?"

"পারবেন না কেন? নিশ্চয়ই পারবেন। চেষ্টা করলেই পারবেন। আমার পরিচিত একজন স্কিৎজোফ্রেনিয়া পেশেন্ট ছিল—"

ডাক্তার সাহেব সেই রোগীটার কথা বলতে লাগলেন, টুম্পা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার আব্বু কী আবার ছবি আঁকতে পারবেন?

ফার্মেসি থেকে আব্বুর, ওষুধগুলি কেনার সময় দোকানদার জিজ্ঞেস করল, "কার ওষুধ এইগুলি?"

এটা কী রকম প্রশ্ন? কার জন্যে ওষুধ সেটা আবার কেন জিজ্ঞেস করবে, আমেরিকায় এরকম একটা প্রশ্ন কেউ কখনো করবে না। এখানে মনে হয় এটা বিচিত্র কিছু না, ছোটখালা বেশ সহজ ভাবেই বললেন, "আমার দুলাভাইয়ের।"

"মাথায় গোলমাল?" টুম্পার ইচ্ছে করল লোকটার মুখে একটা ঘুষি মারে, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখল। ছোট খালা এবারে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘাড় ঝাঁকালেন।

লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, "অনেক কড়া ওষুধ। সময়মতো খেতে হবে। মিস যেন না হয়।"

টুম্পা বলল, "মিস হবে না।"

"আর ঘুম দরকার। অনেক বেশি ঘুম। ভালো মানুষের সাথে মাথা খারাপ মানুষের পার্থক্য হচ্ছে ঘুমে। ঘুম ইয়েস আর ঘুম নো–"

টুম্পা ওষুধের প্যাকেটটা নিয়ে ছোট খালার হাত ধরে বলল, "চল যাই।"

লোকটা পিছন থেকে বলল, "গরুর গোশত যেন না খায়। অমাবশ্যা পূর্ণিমা সাবধান।"

টুম্পা আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, বলল, "আপনিও সাবধান। খালি অমাবশ্যা পূর্ণিমায় না আপনি তার মাঝখানেও সাবধান।"

ছোট খালা টুম্পার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, "কী হলো? তুই হঠাৎ খেপে গেলি কেন?"

"না ছোট খালা খেপি নাই। খেপলে লোকটার মুখে একটা ঘুষি মারতাম না? ঘুষি মেরেছি?"

"না। তা মারিস নি।"

টুম্পা ছোট খালার হাত ধরে বলল, "ছোট খালা আমাকে আব্বুর ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসার জন্যে অনেক থ্যাংকু।"

ছোট খালা হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "কথায় কথায় তোর ঐ আমেঁরিকানদের মতো থ্যাংকু বলা বন্ধ কর দেখি।"

আব্বু একটু অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন। টুম্পা প্যাকেটটা উচু করে বলল, "বল দেখি আব্বু, এই প্যাকেটটার মাঝে কী আছে?"

আব্বু বললেন, "সেটা তো জানি না।"

টুম্পা প্যাকেটটা খুলে দেখালো, "বড় এটা ড্রয়িং খাতা। তার সাথে অনেকগুলো নানা ধরণের পেন্সিল।" টুম্পা খাতাটা তার আব্বুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও, আব্বু। এইটা তোমার জন্যে। তুমি এইটাতে ছবি আঁকবে।"

আব্বু যেন খুব অবাক হলেন, বললেন, "আমি?"

"হ্যাঁ। তুমি।"

আব্বু খাতাটা হাতে নিয়ে একটা সাদা পৃষ্ঠা বের করে বসে রইলেন। টুম্পা আব্বুর হাতে একটা সিক্স বি পেন্সিল ধরিয়ে দিয়ে বলল, "নাও আঁকো।"

আব্বু অদ্ভূত ভাবে পেন্সিলটা ধরে বসে রইলেন, টুম্পা আবার বলল, "কী হলো আব্বু, আঁকো।"

"কী আঁকবো?"

"তোমার যেটা ইচ্ছা।"

আব্বু পেন্সিলটা হাতে নিয়ে কাগজে দাগ দেবার মতো ভঙ্গী করলেন। কিন্তু কোনো দাগ দিলেন না। টুম্পা বলল, "কী হলো? আঁকছ না কেন?"

"পারি না।"

"পার না কে বলেছে। তুমি পার আমি জানি। ছোট খালার বাসায় তোমার আঁকা আমার একটা ছবি আছে। কী সুন্দর!"

আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "পারি না।"

"পার। তুমি চেষ্টা কর, আমি দেখি।"

আব্বু আরেকবার পেন্সিলটা নিয়ে কাগজে দাগ দেবার ভঙ্গী করতে লাগলেন, কিন্তু কোনো দাগ দিলেন না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হতাশ গলায় বললেন, "পারি না।"

"কেন পার না?"

"জানি না।"

"আচ্ছা আব্বু আমি যদি তোমার জন্যে ক্যানভাস ইজেল রং তুলি আনি তাহলে তুমি ছবি আঁকবে?"

আব্বু তার হাতের দিকে তাকালেন, তারপর টুম্পার দিকে তাকালেন, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "আমি জানি না।"

"আব্বু তাহলে আমি ছবি আঁকি, তুমি দেখো। আমি যদি ভুল করি তাহলে তুমি ঠিক করে দাও। দেবে?"

আব্বু কোনো কথা না বলে টুম্পার হাতে খাতাটা দিয়ে দিলেন। টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কী আঁকব আব্বু?"

"তোর যেটা ইচ্ছা।"

টুম্পা ঘরের এদিকে সেদিকে তাকালো তারপর জানরার কাছে গিয়ে পর্দাটা টেনে দিলো, আব্বু ভয় পাওয়া গলায় একটা শব্দ করলেন। টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কী হলো আব্বু?"

"জানালার পর্দা টেনে দে। তাড়াতাড়ি। "দেখে ফেলবে।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "না আব্বু। কিছু হবে না। কেউ দেখবে না। তুমি শান্ত হয়ে বস। আমি ঐ যে রাস্তাটার পাশে দোকানটা দেখেছ, সামনে কয়জন বসে চা খাচ্ছে সেইটা আঁকব। দেখেছ– একট কুকুর শুয়ে আছে, দেখেছ? কী সুন্দর!"

আব্বু কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন, খপ করে টুম্পার কাঁধ ধরে ফেললেন। টুম্পা আব্বুর হাতটা ছুটিয়ে তাকে পাশে টেনে বসালো, বলল, "আব্বু তুমি বস, তুমি দেখো আমি কেমন আঁকি।"

আব্বু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন, টুম্পা আর দেরি না করে পেন্সিল দিয়ে আঁকতে শুরু করলো। পেন্সিলের দু তিনটা টান দিতেই আব্বু কেমন যেন শান্ত হয়ে গেলেন। "টুম্পা ধীরে ধীরে ছবিটা আঁকতে থাকে আর আব্বু চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগলেন। মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে টুম্পাকে কিছু একটা বলতে যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেন না। টুম্পা চোখের কোণা দিয়ে আব্বুকে দেখতে দেখতে ছবিটা আঁকতে থাকে।

ছবি আঁকতে তার কীই না ভালো লাগে! তার আব্বু পাশে বসে দেখবে আর সে ছবি আঁকবে এটা কী সে কোনোদিন কল্পনা করেছিল?

ঘরের বাইরে

খাবার টেবিলে টুম্পার প্লেটে ছোট খালা একটা বড় ইলিশ মাছের টুকরো দিলেন, টুম্পা আপত্তি করতে গিয়ে থেমে গেল। তার ইলিশ মাছ খুব ভালো লাগে, কাটা বেছে খেতে খুব সময় লাগে তবুও সে ধৈর্য ধরে ইলিশ মাছ খায়।

সুমি বলল, "টুম্পা আপু আজকাল রাত না হলে তোমার সাথে দেখা হয় না!"

"আই এম সরি–"

সুমি বলল, "না-না-তুমি সরি হবে কেন। মেজো খালুর সাথে তোমার দেখা হয়েছে শুনে আমাদের যে কী ভালো লাগছে। আমাদেরও মেজো খালুকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"আব্বুর সাথে দেখা করা এতো সোজা হবে না! স্কিৎজোফ্রেনিয়া আছে তো—খুব খারাপ অবস্থা!"

রুমি বলল, "দেখা না হলেও ঠিক আছে! তোমার কাছ থেকে গল্প শুনতেই এতো মজা লাগে আমার!"

সুমি বলল "হ্যাঁ। টুম্পা আপু তুমি এতো মজা করে গল্প করতে পার।"

"আজকে কী হয়েছে বলবে আপু! সবকিছু–"

ছোট খালা একটা ধমক দিলেন, বললেন, "মেয়েটাকে খেতে দে দেখি। সারাক্ষণ নিজেরাও বকর বকর করবি অন্যদেরকেও বকর বকর করাবি!"

টুম্পা হেসে বলল, "আমারও বকর বকর করতে খুব ভালো লাগে ছোট খালা!"

"এতো ভালো লাগিয়ে কাজ নেই, আগে খা। এখানে এসে যদি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাস তোর আম্মু আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।"

টুম্পা মাথা নাড়লো, বলল, "না ছোট খালা, আরও খুশি হবে। আমেরিকাতে শুকনা থাকা হচ্ছে স্টাইল। যে যত শুকনা সে তত সুন্দরী। কিন্তু তোমার সেইটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না– আমি রাক্ষসের মতো খাচ্ছি। শুধু যদি ইলিশ মাছে এতো কাটা না থাকতো–"

"দেব আমি কাটা বেছে?"

"না না ছোট খালা–"

"আমার সাথে ঢং করিস না। দে বেছে দিই–" বলে সত্যি সত্যি টুম্পার মাছটা নিয়ে কাটা বেছে দিতে লাগলেন। সুমি আর রুমি চোখ বড় বড় করে টুম্পার দিকে তাকিয়েছিল, টুম্পা বলল, "তোমরা এইভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? আগে কখনো কাউকে মাছের কাঁটা বেছে দিতে দেখ নাই? নাকি তোমাদের হিংসা হচ্ছে!"

রুমি মাথা নাড়ল, "না টুম্পা আপু মোটেও হিংসা হচ্ছে না।"

টুম্পা খুব সখ করে ইলিশ মাছ খেতে খেতে বলল, "ছোট খালু, এখানে ভালো আর্ট সাপ্লাই কোথায় পাওয়া যায়?"

ছোট খালু জিজ্ঞেস করলেন, "কী রকম আর্ট সাপ্লাই?"

"আমি আব্বুকে দিয়ে ছবি আঁকানোর চেষ্টা করছিলাম, আব্বু দেখি কিছুতেই আঁকতে চান না। তাই ভাবছিলাম একটা ইজেল, কয়েকটা ক্যানভাস আর এক্রেলিক পেইন্ট কিনে দিই। সবগুলো রং থাকলে মনে হয় আঁকতে ইচ্ছে করবে। কোথায় পাওয়া যাবে ছোট খালু?"

"নিউ মার্কেট। এসবের জন্যে নিউ মার্কেট সবচেয়ে ভালো।"

টুম্পা ছোট খালাকে বলল, "আমাকে একটু নিউ মার্কেট নিয়ে যাবে ছোট খালা?"

সুমি বলল, "আমিও যাব তোমার সাথে।"

রুমি বলল, "তাহলে আমিও যাব।"

টুম্পা একবার রুমির দিকে আরেকবার সুমির দিকে তাকিয়ে বলল, "আই এম রিয়েলি সরি।"

"কেন তুমি রিয়েলি সরি?"

"কোথায় আমাদের সবাই মিলে কক্সবাজার রাঙ্গামাটি যাবার কথা, তার বদলে আমরা যাচ্ছি নিউমার্কেটে রং কিনতে!"

"না, টুম্পা আপু–"

"আমার খুব খারাপ লাগছে! তোমাদের সবার সব রকম প্ল্যান আমার জন্যে উল্টাপাল্টা হয়ে গেল।"

সুমি বলল, "না টুম্পা আপু, তুমি এরকম বলো না। কক্সবাজার রাঙ্গামাটি গেলে আমাদের যত আনন্দ হতো তোমাকে এতো খুশি দেখে আমাদের তার চেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে!"

ছোট খালু বললেন, "সুমি কথাটা ভুল বলে নাই। ঠিকই বলেছে। আমরাও যদি কিছু করতে পারতাম তাহলে আরও ভালো লাগতো।"

"ছোট খালু, আপনাদের আর কিছু করতে হবে না। আমার এই সব সহ্য করছেন সেইটাই অনেক বেশি। থ্যাংকু। থ্যাংকু থ্যাংকু।"

ছোট খালা ইলিশ মাছের আরেকটা বড় টুকরো প্লেটে নিয়ে বললেন, "আরে এই মেয়েটাকে নিয়ে দেখি মহা মুশকিল। কথায় কথায় খালি বলে থ্যাংকু।"

টুম্পা যখন ঘাড়ে করে বড় ইজেলটা নিয়ে ঢুকলো আব্বু একটু অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকালেন। টুম্পা বলল, "দেখো তোমার জন্যে কী এনেছি।"

আব্বুর চোখ কেমন যেন চক চক করে উঠলো। ইজেলটা ধরে তার উপরে হাত বুলালেন। টুম্পা বগল থেকে ফ্রেমে লাগনো ক্যানভাসগুলো নামাতে নামাতে বলল, "কয়েক সাইজের ক্যানভাস এনেছি। তোমার যেরকম ইচ্ছা করবে সেরকম আঁকবে।"

ইজেলের মাঝে মাঝারী সাইজের একটা ক্যানভাস লাগিয়ে বলল, "এই দেখো কী সুন্দর। দেখলেই ছবি আঁকার জন্যে হাত চুলবুল করে, তাই না আব্বু?"

আব্বু কোনো কথা না বলে সাবধানে ক্যানভাসের উপর হাত বুলালেন। টুম্পা তার পিঠ থেকে ব্যাকপেকটা নামিয়ে ভেতর থেকে এক্রেলিক রংগুলো বের করে বলল, "বারোটা রঙয়ের একটা সেট এনেছি। ইন্ডিয়ান। দোকানদার বলেছে কোয়ালিটি না কী ভালোই, সবাই এগুলোই ব্যবহার করে। জার্মান রংগুলোর দাম অনেক বেশি।"

টুম্পা চারটা আলাদা আলাদা সাইজের তুলি বের করে বলল, "আব্বু এই তুলিগুলো এনেছি তোমার জন্যে। কাজ চলবে না?"

আব্বু তুলিগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন, কোনো কথা বললেন না। টুম্পা ইজেলটা টেনে জানালার কাছে নিয়ে পর্দাটা টেনে দিতেই ঘরের ভেতর এক ঝলক আলো এসে ঢুকলো। আব্বু হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে দুইপা পিছিয়ে গিয়ে একটা ভয়ের মতো শব্দ করলেন। টুম্পা বলল, "কী হয়েছে?"

"জানালাটা বন্ধ কর। কেউ দেখে ফেলবে।"

"কেউ দেখবে না আব্বু। আর দেখলেও কোনো ক্ষতি নেই।"

"কেন ক্ষতি নেই?"

টুম্পা শান্ত গলায় বলল, "আব্বু, তুমি তো খুব স্মার্ট একজন মানুষ, তাই না আব্বু?"

"কেন?"

"তুমি আগে বল, তুমি স্মার্ট মানুষ কী না? যদি তুমি স্মার্ট না হতে তাহলে তুমি কী এতো বড় আর্টিস্ট হতে পারতে? এতো কম বয়সে জাতীয় পুরস্কার পেতে? বল।"

"এর সাথে স্মার্ট হওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই।"

"আছে।" টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "সম্পর্ক আছে। তোমার একটা জিনিষ বুঝতে হবে।"

"কী জিনিষ?"

"তোমার একটা অসুখ আছে সেইটার নাম স্কিৎজোফ্রেনিয়া। খুব ভয়ংকর অসুখ। তোমার সেই অসুখটা নিয়ে বাঁচা শিখতে হবে।"

আব্বুকে কেমন জানি অসহায় দেখালো, মাথা নেড়ে বললো, "টুম্পা, তোর কোনো কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

"তুমি সব সময় বল তোমাকে সি.আই.এ. মার্ডার করার জন্যে আসছে। তুমি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তাদের দেখতে পাও। পাও না?"

"হ্যাঁ। দেখতে না পেলে কখনো বলতাম?"

"তোমার এখন বুঝতে হবে যে আসলে তারা নাই। তোমার তাদের দেখা পাওয়াটা হচ্ছে তোমার অসুখ। তোমার স্কিৎজোফ্রেনিয়া আছে বলে সেটা তুমি দেখো। এটাই তোমার অসুখ।"

"তুই কী বলছিস আবোল তাবোল?"

"আমি আবোল তাবোল বলছি না আব্বু, আমি একেবারে সত্যি কথা বলছি। তুমি যখন দেখবে কোনো সি.আই.এ. তোমাকে মার্ডার করতে আসছে

তখন তুমি নিজেকে বলবে, আসলে এরা মিথ্যা। আমি এদেরকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এরা মিথ্যা। আমার স্কিৎজোফ্রেনিয়া আছে বলে আমি এদেরকে দেখি। মিথ্যা মিথ্যা দেখি।"

আব্বু অবাক হয়ে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন। টুম্পা আব্বুর হাত ধরে বলল, "আব্বু। আমি তোমার মেয়ে। তোমাকে আমি অসম্ভব ভালোবাসি। অসম্ভব অসম্ভব ভালোবাসি। অমি কী তোমাকে মিথ্যা কথা বলব?"

আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "না।"

"তাহলে?"

আব্বু কোনো কথা না বলে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইলেন। টুম্পা বলল, "আব্বু, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি চাই তুমি আস্তে আবার নরমাল হয়ে যাও। হাসো, কথা বল, ঘর থেকে বের হও, সবার বাসায় বেড়াতে যাও, আর সবচেয়ে বড় কথা– তুমি আবার ছবি আঁকা শুরু করো।"

আব্বু একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। টুম্পা আব্বুকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি জানি তুমি পারবে আব্বু। তুমি পারবেই পারবে। তুমি চেষ্টা করো ছবি আঁকতে। নাও এই তুলিটা ধরো–"

টুম্পা আব্বু হাতে তুলিটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, "বল তুমি আগে তোমাকে কোন রংটা গুলে দেব। বল।"

আব্বু কিছু বললেন না তুলি হাতে সাদা ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ক্যানভাসে আঁকার আগে সেটা মাথার ভেতরে আঁকতে হয়। ছবিটার কথা ভাবতে হয়।"

টুম্পা উজ্জ্বল মুখে বলল, "তুমি সেটা ভাব আব্বু। আমি তো সেইটাই চাই।"

"সেটার জন্যে তো সময় লাগে।"

"তুমি সময় নাও আব্বু। তোমার যত সময় লাগে তুমি ততো সময় নাও। আমি তোমাকে তাড়াহুড়া করবো না।"

আব্বু তখন ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, টুম্পা দেখলো তার আব্বুর চোখ জ্বল জ্বল করছে, ভুরুগুলো কুঁচকে আছে দেখে মনে হচ্ছে তার কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। টুম্পা ঠিক বুঝতে পারল না, সে কী না জেনে তার আব্বুকে কোনো বিপদের মাঝে ঠেলে দিচ্ছে?

আব্বু অনেকক্ষণ ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার বিছানায় বসে বললেন, "পারছি না।"

আব্বুর মুখ দেখে টুম্পার খুব মায়া হলো। টুম্পা বলল, "থাক আব্বু আজ থাক। যখন তোমার ইচ্ছে করবে তখন তুমি আঁকবে।"

আব্বু আবার আরেকটা নিঃশ্বাস ফেললেন, আগেরটা থেকেও বড়, তারপর বললেন, "আমি মনে হয় আর কোনোদিনই ছবি আঁকতে পারব না।"

"কেন এরকম কথা বলছ আব্বু?"

"কতোদিন আমি ছবি আঁকি না জানিস? জোর করে কী আর ছবি আঁকা যায়?"

"ঠিক আছে তোমার জোর করে ছবি আঁকতে হবে না। যেদিন তোমার ইচ্ছে করবে সেদিন আঁকবে। চল এখন আমরা বাইরে থেকে হেঁটে আসি।"

আব্বু চোখ বড় বড় করে বললেন, "হেঁটে আসি? বাইরে থেকে?"

"হ্যাঁ। তুমি কী সারা জীবন দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে না কী? তোমাকে ঘর থেকে বের হতে হবে না?"

"কিন্তু–"

"আব্বু আমি তোমার কোনো কিন্তু শুনব না। চল আমার সাথে। একটু হেঁটে আসি। তারপর কোনো এটা ফাস্টফুডের দোকানে বসে আমরা খাব। বাবা এবং মেয়ের নিরিবিলি লাঞ্চ!"

আব্বু আবার বললেন, "কিন্তু–"

"কোনো কিন্তু না। চল আব্বু চল। ঘর থেকে বের হলেই তুমি দেখবে আসলে তোমার সব ভয় হচ্ছে মিথ্যা।"

টুম্পা শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি আব্বুকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এল। অভ্যাস নেই বলে সিড়ি দিয়ে নামতে আব্বুর রীতিমতো অসুবিধে হচ্ছিল, টুম্পা সাবধানে আব্বুকে হাত ধরে নামালো। গেট খুলে বের হবার সময় টুম্পা লক্ষ করল আব্বু অল্প অল্প কাঁপছেন। টুম্পা আব্বুর হাত ধরে রাখে, হাতটি বরফের মতো ঠাণ্ডা। আব্বুকে ধরে ধরে টুম্পা রাস্তায় নিয়ে আসে। রাস্তার দুই পাশে দোকান, দোকানের ভেতরে মানুষ। ফুটপাথ ধরে মানুষ হাঁটছে। রাস্তায় রিকশা, সি.এন.জি. ক্যাব আর গাড়ি শব্দ করতে করতে যাচ্ছে– সেগুলোর ভেতরেও মানুষ। আব্বুকে দেখে মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষকেই আব্বু সন্দেহ করছেন, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন তারা আব্বুকে

খুন করতে চাইছে কী না। টুম্পা নরম গলায় আব্বুর সাথে কথা বলতে থাকে, বলে, "আব্বু তুমি অনেক টেন্সড আপ হয়ে আছ। একটু রিলাক্স করো আব্বু, দেখো তোমার ভয়ের কিছু নেই। ঐ ছোট বাচ্চাটাকে দেখো আব্বু কতো কিউট, দেখেছ? এইটুকুন ছোট বাচ্চা পত্রিকা বিক্রি করছে, দেখে কী মায়া লাগে, তাই না? আমেরিকা থেকে এই দেশে এসে আমার সবচেয়ে বেশি অবাক লেগেছে কী জান? এই দেশে ছোট বাচ্চাদের কতো কষ্ট! খুব মায়া লাগে—"

আব্বু টুম্পার কোনো কথা শুনছিলেন কী না বোঝা যাচ্ছিল না, টুম্পার হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলেন। টুম্পা অনুভব করল আব্বু খুব ধীরে ধীরে একটু সহজ হয়েছেন। পুরো শরীরটা এতোক্ষণ শক্ত হয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেটা একটু শিথিল হয়েছে, এতোক্ষণ মনে হয় নিঃশ্বাস আটকে রেখেছিলেন, এখন সহজ ভাবেই নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। শুধু ভয়ে ভয়ে মানুষের মুখের দিকে না তাকিয়ে এখন অন্য সব কিছুই দেখছেন। একটা গরু হেলতে দুলতে যাচ্ছিল আব্বু খুব মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখলেন এবং একটু হেসে ফেললেন। রাস্তার পাশে ময়লা জমে আছে সেখানে কয়েকটা কাক জোরে জোরে কা কা শব্দ করে ঝগড়া করছিল আব্বু সেটাও খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। হাঁটতে হাঁটতে থেমে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর ইলেকট্রিক তারের দিকে তাকালেন, ঘরের কার্নিশে বসে থাকা চড়ুই পাখিগুলো দেখলেন। দেখে খুব মজা পেলেন বলে মনে হলো।

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "আব্বু, তুমি কোথাও বসবে?"

"কেন?"

"তোমার তো হেঁটে অভ্যাস নেই। টায়ার্ড হয়ে যাও নাই?"

"না। টায়ার্ড হই নাই।"

"টায়ার্ড হলে বলো, তাহলে আমরা কোথাও রেস্ট নেবো।"

"ঠিক আছে, বলব।"

দুজনে আরও কিছুক্ষণ হাঁটলো। রাস্তার পাশে একটা আধুনিক শপিং মল পাওয়া গেল। আব্বু ঢুকতে রাজী হচ্ছিলেন না টুম্পা বুঝিয়ে শুনিয়ে ভিতর নিয়ে গেল। ভিতরে ঢুকে অবশ্যি আব্বু খুব মজা পেলেন বলে মনে হলো, খুব আগ্রহ নিয়ে দোকানগুলোকে দেখলেন। একটা বইয়ের দোকানের ভেতরে সাহস করে ঢুকে অনেক সময় নিয়ে বইগুলো দেখলেন।

একটু পরে টুম্পার নিজেরই খিদে লাগতে লাগলো, সে আব্বুর হাত ধরে বলল, "আব্বু খিদে লেগেছে।"

"খিদে লেগেছে?"

"হ্যাঁ আব্বু। খাব।"

আব্বুকে একটু দুশ্চিন্তিত দেখায়, "কোথায় খাবি?"

"এই যে বাইরে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান আছে।"

"ফাস্ট ফুড?" আব্বুকে দেখে মনে হলো আব্বু ফাস্ট ফুড কথাটাও ঠিক ভালো করে বুঝতে পারলেন না।

"হ্যাঁ। ফাস্ট ফুড। আস আমার সাথে।" টুম্পা তার আব্বুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসে। একটু হেঁটে ফাস্ট ফুডের দোকানটা খুঁজে বের করে দুজনে ভিতরে ঢুকলো। আব্বুকে এক জায়গায় বসিয়ে সে গেল খাবার আনতে।

দুজনে খেয়ে যখন বের হয়েছে তখন আব্বু বললেন, "এখন বাসায় যাব।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। বাসায় গিয়ে তুমি এখন ঘুমাবে।"

আব্বু বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়লেন। ফিরে যেতে শুরু করায় একটু পরেই টুম্পা আবিষ্কার করলো সে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। খানিকদূর গিয়ে বুঝতে পারলো ভুল রাস্তায় এসেছে তখন আবার আগের জায়গায় ফিরে এসে নূতন করে রওনা দিতে হলো। খানিকদুর গিয়ে টুম্পার মনে হতে লাগলো রাস্তাটা অপরিচিত মনে হচ্ছে। টুম্পা তবুও আরেকটু এগিয়ে যায় অবাক হয়ে দেখে রাস্তাটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। আব্বু মনে হয় ঠিক বুঝতে পারছেন না, টুম্পার সাথে সাথে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছেন। টুম্পা তখন আবার ফিরে যাবার জন্যে রওনা দিতে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ কোথা থেকে কয়েকজন মানুষ ছুটে আসতে থাকে। তাদের ছুটে আসার ভঙ্গিটা দেখে টুম্পার বুকটা হঠাৎ ধ্বক করে ওঠে। সামনের মানুষটার হাতে একটা রিভলবার সেটা উঁচু করে রেখেছে। কিছু বোঝার আগেই মানুষগুলো তাদের দুজনকে ঘিরে ফেলল। রিভলবার হাতে মানুষটা আব্বুর বুকের কাপড় ধরে মাথার মাঝে রিভলবার লাগিয়ে চিৎকার করে বলল, "যা আছে বের কর শূওরের বাচ্চা!"

দুইজন এসে টুম্পাকে ধরে ফেলেছে, একজন তার গলায় লকেটটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সেটা ছিড়ে নিয়েছে। টুম্পা কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু টের পাচ্ছে ভযাবহ একটা আতংকে তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। কেউ

একজন একটা চাকু বের করে তার গলায় ধরে বলছে, "মোবাইল দে। মোবাইল দে ছেমড়ি।"

টুম্পা কোনোমতে বলল, "মোবাইল নাই।"

"খবরদার মিছা কথা বলবি না, জবাই কইরা ফালামু-"

টুম্পা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই একজন তার আব্বুকে বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "মানি ব্যাগ বের কর—", আব্বু একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন, কপালের কাছে একটু কেটে গেল কিন্তু একটুও শব্দ করলেন না, তার চোখের মাঝে অদ্ভুত একটা শূন্য দৃষ্টি। মানুষগুলো আব্বুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলবারটা দিয়ে আব্বুর মাথায় মেরে বলল, "মানিব্যাগ দে শূওরের বাচ্চা, দে মানিব্যাগ!" আব্বু কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না- ঠোট দুটো শুধু নড়তে লাগলো।

টুম্পা টের পেলো কেউ একজন তার ব্যাগটা হ্যাচকা টান দিয়ে নিয়ে নিয়েছে- খামচি দিয়ে তার চুল ধরে পিছনে টেনে নিতে গিয়ে ছেড়ে দিল। কিছু বোঝার আগে মানুষগুলো হঠাৎ করে তাদের ছেড়ে দিয়ে ধুপধাপ করে দৌড়ে চলে যেতে শুরু করে- টুম্পা তখনও পরিষ্কার করে কিছু বুঝতে পারছে না, মনে হয় একটা ভয়াবহ ঘোরের মাঝে আছে, মনে হচ্ছে বুঝি একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখছে। টুম্পা তার আব্বুর কাছে গিয়ে আব্বুর হাত ধরলো, আব্বুর শরীর থরথর করে কাঁপছে, চোখ মুখে একটা অসহায় আতংক। কপাল কেটে রক্ত বের হচ্ছে, মুখের একটা পাশ রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। টুম্পা মুখ তুলে তাকালো, একটা গাড়ি আসছে, গাড়িটা তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল হঠাৎ করে থেমে গেল। দরজা খুলে একজন মানুষ নেমে এসেছে, অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

টুম্পা আব্বুকে ধরে রেখে বলল, "আমার আব্বু- আমার আব্বু-"

মানুষটা আবার জিজ্ঞেস করল, "ছিনতাই?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল "একটা ফোন করে দেবেন, প্লিজ?"

মানুষটা পকেট থেকে মোবাইল বের করে বলল "কত নম্বর?"

টুম্পা ছোট খালার নম্বরটা দেয়, শুধু এই নম্বরটা তার জানা আছে। মানুষটি ছোট খালার কাছে যখন ফোন করছে টুম্পা তখন তার আব্বুকে ডাকলো, "আব্বু! আব্বু!"

আব্বু মাথা ঘুরিয়ে টুম্পার দিকে তাকালেন, টুম্পাকে দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠে মুখ ঢেকে ফেললেন, মাথা নেড়ে বলতে থাকলেন, "না–না–না।"

"আমি টুম্পা, অমি টুম্পা–"

আব্বু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "চলে যাও-চলে যাও তুমি চলে যাও।"

আব্বুর কথা শুনে হঠাৎ টুম্পার বুকটা ভেঙে গেল। তাকে তুমি করে বলছেন কেন? চলে যেতে বলছেন কেন?

গাড়ি থেকে নেমে আসা মানুষটা তার মোবাইল টেলিফোনটা টুম্পার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও। কথা বলো–"

টুম্পা টেলিফোনটা হাতে নেয়, তাকিয়ে দেখে তাদের ঘিরে একদল মানুষের ভীড় জমে উঠছে। একটু আগে রাস্তাটা ফাঁকা ছিল, এখন হঠাৎ করে এতো মানুষ কোথা থেকে এসেছে? টুম্পা টেলিফোনটা হাতে নিতেই শুনতে পেল অন্যপাশ থেকে ছোট খালা চিৎকার করে বলছেন, "কী হয়েছে টুম্পা? কী হয়েছে?"

টুম্পা ভাঙ্গা গলায় বলল, "ছোটখালা–" তারপর ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো।

হাসপাতালের বারান্দায় টুম্পা দাড়িয়েছিল, টুম্পার হাত ধরে রেখেছে সুমি। টুম্পাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন ভেতর থেকে ডাক্তার সাহেব, ছোট খালা, ছোট খালু, শুভ চৌধুরী এবং আরো দুয়েকজন বের হয়ে এলেন। টুম্পা একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আব্বু কেমন আছেন?"

ডাক্তার সাহেব বললেন, "ভালো।"

"মাথায় যে ব্যথা পেয়েছেন–"

ডাক্তার সাহেব হাত দিয়ে ওটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "ওটা খুব মাইনর একটু কাট। সারফেস উন্ড। ব্লিডিং হয়েছিল বলে সবাই ঘাবড়ে গেছে। কোনো স্টিচ পর্যন্ত লাগে নি।"

টুম্পা বুক থেকে আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দেয়। ডাক্তার সাহেব বললেন, "তবে–"

"তবে কী?"

"তোমার আব্বুর সমস্যাটা কিন্তু মাথার কাটাটা না। সমস্যা সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়।"

টুম্পা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "সমস্যা কোথায়?"

"তোমাকে বলেছি যে তোমার আব্বুর স্কিৎজোফ্রেনিয়া আছে। তার একটা ইলিউশন আছে যে তাকে কিছু মানুষ মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে। আজকের ঘটনার পরে তোমার আব্বুর ধারণা একেবারে কনফার্ম হয়েছে। তার ধারণা-"

"কী ধারণা?"

ডাক্তার সাহেব একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "আমি ঠিক কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না।"

শুভ চৌধুরী একটু এগিয়ে এসে বললেন, "আমি বলছি।" তারপর টুম্পার দিকে তাকালেন। ডান হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো সোজা করতে করতে বললেন, "দেখো মেয়ে আমি কোনো ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলি। তুমি বুলবুলের মেয়ে, থাকো আমেরিকায়। দুইদিনের জন্যে দেশে বেড়াতে এসে বুলবুলের জীবন নষ্ট করার তোমার কোনো রাইট নাই।"

ছোট খালা বাধা দিয়ে বললেন, "আরে! আপনি কী বলছেন?"

শুভ চৌধুরী চোখ কটমট করে ছোট খালার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখেন-আপনারা কোনো কথা বলবেন না। গত দশ বছর এই মানুষটার কেউ খোঁজ খবর নেয় নাই। খোঁজ নিয়েছি আমি। বুঝেছেন? তাই আপনারা বড় বড় কথা বলবেন না।"

শুভ চৌধুরী টুম্পার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি সেদিনের বাচ্চা মেয়ে এখানে এসে বুলবুলকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলে কোন সাহসে?"

টুম্পার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। সে ফ্যাকাসে মুখে শুভ চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে রইলো। চৌধুরী বললেন, "লাইফটা একটা নাটক না যে তুমি দুইদিনের জন্যে আমেরিকা থেকে এসে একটা পার্ট করে চলে গেলে। এই মানুষটাকে তোমরা কেউ দেখে রাখবে না- তাকে দেখে রাখব আমরা। কাজেই তোমরা যখন খুশি এসে তাকে নিয়ে ইমোশনাল ব্ল্যাক মেলিং করতে পারবে না।"

টুম্পা ফিস ফিস করে বলল, "আই এম সরি।"

শুভ চৌধুরী বলল, "তুমি জান তুমি তোমার আব্বুর কতো বড় ড্যামেজ করেছ? চারজন মানুষ মিলে ধরে রাখতে পারে না। হাসপাতালের বেডে জন্তুর

মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়েছে। সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছে– ঘুম থেকে ওঠে কী করবে কেউ জানে না। ডু ইউ নো?"

টুম্পার চোখ থেকে এক ফোটা পানি বের হয়ে গাল বেয়ে নিচে নেমে এল। শুভ চৌধুরী সেটা লক্ষ্য করল বলে মনে হলো না, নিষ্ঠুরের মতো বললেন, "তোমার কী লাভ হলো? তোমার আব্বু নিজে এখন বিশ্বাস করে তুমি তাকে খুন করার জন্যে নিয়ে গেছো। তোমার মুখ দেখলে মানুষটা ভয়ে চিৎকার করতে থাকে! এই সব কিছু হয়েছে তোমার জন্যে। বুঝেছ?"

টুম্পা মাথা নিচু করে ঠোঁট কামড়ে ধরল, ডাক্তার সাহেব বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে যথেষ্ট হয়েছে।"

"না না যথেষ্ট হয় নাই।" শুভ চৌধুরী রেগে ওঠে বললেন, "দশ বছর কেউ মানুষটার কোনো খোঁজ নেয় নাই। এখন হঠাৎ করে এসে মানুষটাকে নিয়ে নাটক? শোনো মেয়ে, আমি তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই। হাসপাতাল থেকে বুলবুল যখন রিলিজ পাবে, সে যখন তার বাসায় যাবে আমি তোমাকে তার ধারে কাছে দেখতে চাই না। বুঝেছ?"

টুম্পা হাত দিয়ে চেপে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "বুঝেছি।"

"তুমি তোমার আব্বুকে যদি শেষবার দেখে যেতে চাও, তাহলে যাও কেবিনের ভেতরে গিয়ে দেখে আস। যখন ঘুমিয়ে আছে তখন। মানুষটা জেগে উঠলে তুমি আর তার সামনে যেতে পারবে না– দড়ি দিয়ে একটা মানুষকে বেঁধে রাখলে মানুষকে কেমন দেখায় সেটাও তুমি দেখে আস।"

টুম্পা মুখ তুলে সবার দিকে তাকাল, তারপর বলল, "ঠিক আছে। আমি আব্বুকে গুড বাই বলে আসি।"

সবাই বাইরে দাড়িয়ে রইল, টুম্পা বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে কেবিনের ভেতর ঢুকে গেল। ছোট খালা ভেতরে ঢুকতে গিয়ে থেমে গেলেন, ভেতর থেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্নার আওয়াজ আসছে। এই মায়াবতী মেয়েটির কষ্ট নিজের চোখে দেখতে চান না ছোট খালা।

ফিরে আসা

সুমি টুম্পার হাত ধরে বসেছিল। দু'জনে বারান্দায় বসেছে কারো মুখে কোনো কথা নেই। বাইরে অন্ধকারে নেমেছে, ওরা তবু কোনো আলো জ্বালায় নি। সুমি নরম গলায় বলল, "টুম্পা আপু তুমি মন খারাপ করো ন। তোমাকে মন খারাপ করতে দেখলে আমার অসম্ভব খারাপ লাগে।"

"শোন সুমি, এরকম একটা কিছু হলে যেটুকু মন খারাপ হবার কথা তার থেকে আমি একটুও বেশি মন খারাপ করছি না।"

"টুম্পা আপু–" সুমি নিচু গলায় বলল, "ঐ লোকটা তোমাকে যে খারাপ খারাপ কথা বলেছে, তুমি সেটা নিয়ে মন খারাপ করো না।"

টুম্পা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "লোকটা আসলে খারাপ খারাপ কথা বলে নাই। সত্য কথা বলেছে। কথাগুলো শুনতে খারাপ লেগেছে কিন্তু প্রত্যেকটা কথা সত্যি।"

সুমি মাথা নাড়ল, বলল, "না সত্যি না।"

"সত্যি।" টুম্পা বলল, "আমি এখানে থাকব না, এসেছি মাত্র কয়েকদিনের জন্যে আমার উচিত হয় নি আব্বুর সাথে এইভাবে জড়িয়ে পড়া। কিন্তু–কিন্তু–তুইই বল, আমি যদি জানি আমার আব্বু এভাবে আছেন আমি তাহলে তার সাথে দেখা না করে থাকতে পারতাম? আর দেখা হলে তার সাথে না মিশে পারতাম?"

"না, পারতে না।"

"কিন্তু পারা উচিত ছিল। আব্বু তো আর অন্য দশটা মানুষের মতো না। আব্বু স্কিৎজোফ্রেনিয়ার রোগী। আব্বুকে এভবে ঘর থেকে বের করে আনা ঠিক হয় নাই। আমি একবারও বুঝতে পারি নাই এই রকম কিছু হবে। সুমি তুমি

বিশ্বাস কর যখন আমি দেখলাম আব্বুর মাথায় একটা রিভলবার ধরেছে, আমার যা ভয় লেগেছিল–"

সুমি টুম্পার হাত ধরে বলল, "কেন ওই কথাগুলোর কথা মনে করছ? ভুলে যাও টুম্পা আপু।"

"যদি ভুলে যাওয়ার একটা সুইচ থাকতো তাহলে আমি টুক করে সেই সুইচটা অফ করে দিয়ে সব কিছু ভুলে যেতাম।"

সুমি কোনো কথা বলল না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে টুম্পা বলল, "আমাদের সবাইকে নিয়ে কক্সবাজার রাঙামাটি এসব জায়গায় যাবার কথা ছিল, মনে আছে? কতোদিন থেকে যেতে চেষ্টা করছি, যেতে পারছি না। এখন যেতে পারব।"

সুমি কোনো কথা বলল না, টুম্পা বলল, "দোকানের সামনে ছোট বাচ্চাগুলোর ছবি তুলেছিলাম মনে আছে? তাদের ছবিগুলোও প্রিন্ট করে দিতে হবে, কতোদিন থেকে বাচ্চাগুলি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে আছে।"

সুমি এবারেও কোনো কথা বলল না। টুম্পা বলল, "সবাই মিলে একটা বাংলা নাটক দেখার কথা ছিল, মনে আছে? আর একটা বাংলা সিনেমা? এখন আমরা সেটাও দেখতে পারব। বাংলাদেশে এসে আসলে এখনো তো কিছুই করি নাই।"

সুমি এবারেও কোনো কথা বলল না, দুইজন চুপচাপ অন্ধকারে বসে রইল।

রাত্রে খাবার টেবিলে আজকে কেউ বেশি কথা বলল না। কথাবার্তায় কেউ একটিবারও সুমির আব্বুর কথা তুলল না। কথা যেটুকু সেটা ছিল ছোট খালার রান্না, ছোট খালুর অফিসের একজন বোকা অফিসার আর সুমির স্কুলের একজন রাজাকার টাইপ টিচারকে নিয়ে। খাওয়া শেষ করে আজকে অন্যদিনের মতো সবাই বসে গল্প গুজব করল না, যে যার মতোন শুয়ে পড়ল।

টুম্পা বিছানায় অনেক রাত পর্যন্ত নিঃশব্দে শুয়ে রইল তার চোখে ঘুম আসছিল না। গভীর রাতে তার ঘরের দরজা খুলে ছোট খালা এসে ঢুকলেন, নিচু গলায় খালায় বললেন, "টুম্পা, মা ঘুমিয়ে গেছিস?"

"না, ছোট খালা।"

ছোট খালা মশারির ভেতর ঢুকে টুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আমি খোঁজ নেওয়ার জন্যে হাসপাতালে ফোন করেছিলাম। তোর আব্বু ভালোই আছেন। কাল সকালে রিলিজ করে দেবে।"

"থ্যাংক ইউ ছোট খালা।"

"তুই কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করিস না।"

"আমি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করছি না, ছোট খালা।" তুমি ঘুমাতে যাও।"

ছোট খালা টুম্পার মাথায় হাত বুলাতে থাকলেন, ঘুমাতে গেলেন না।

রাঙ্গামাটি এবং কক্সবাজার যাবার কথা অনেকদিন থেকে বলা হচ্ছিল কিন্তু পরের দিন ঘুম থেকে উঠে সবাইকে নিয়ে ছোট খালু একটা চা বাগানে রওনা দিলেন। ঢাকা শহর থেকে বের হতেই তাদের দেড় ঘণ্টা লেগে গেল। রাস্তায় যা ভীড় সেটা আর বলার মতো নয়, ভীড় ব্যাপারটা টুম্পার অবশ্যি খারাপ লাগে না– গাড়ির ভেতরে বসে বসে রাস্তার মানুষগুলো দেখা খুব মজার একটা ব্যাপার। একেকজন মানুষের মুখের ভঙ্গী একেক রকম, কেউ গম্ভীর কেউ খুশি, কেউ রাগ, কেউ বিরক্ত কেউ কেউ একেবারে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এক জায়গায় দেখা গেল দুইজন হাতাহাতি করছে, অন্য মানুষেরা গোল হয়ে দেখছে, মনে হয় ব্যাপারটা বেশ উপভোগই করছে!

গাড়ি একটু যায় তারপর থেমে যায় তারপর আবার একটু যায়, ঘণ্টা খানেক এরকম হবার পর রুমি হড় হড় করে বমি করে দিলো। ভাগ্যিস বমি করার আগে রুমি একটা ওয়ার্নিং দিয়েছিল তাই ছোট খালার কোলের উপর বমি না করে জানালা দিয়ে মাথা বের করে বাইরে বমি করতে পারল। সকালে রুমি এমন কিছু খায় নি কিন্তু বমি করলো অনেক কিছু– কোথা থেকে সেগুলো পেটে এসেছে কে জানে!

শেষ পর্যন্ত ভীড় পার হয়ে তারা হাইওয়েতে উঠে গেল, তখন রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। ফাঁকা রাস্তায় এসে টুম্পার মনে হলো ভীড়টাই বুঝি ভালো ছিল, কারণ গাড়ির ড্রাইভার ফাঁকা রাস্তায় যেভাবে গাড়ি চালাতে লাগলো যে মনে হতে লাগলো এটা গাড়ি নয়, এটা বুঝি একটা প্লেন—এটা বুঝি এক্ষুণি রাস্তা ছেড়ে আকাশে উড়ে যাবে। সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে উল্টোদিক থেকে আসা দৈত্যের মতো বাস আর ট্রাকগুলো। ড্রাইভারেরা একেবারে সোজাসুজি একজন আরেকজনের দিকে এগুতে থাক, অনেকটা যেন কার নার্ভ কতো শক্ত তার একটা পরীক্ষা, একেবারে শেষ মুহূর্তে দুটি গাড়ি একটু সরে একজন আরেকজনকে জায়গা করে দেয়। টুম্পার প্রত্যেকবারই মনে হয় এক্ষুণি বুঝি

একটা একসিডেন্ট হয়ে সবাই ছাতু হয়ে যাবে, কিন্তু একসিডেন্ট হয় না। টুম্পা অবাক হয়ে দেখলো তাদের ড্রাইভার এরকম পাগলের মতো গাড়ি চালাচ্ছে কিন্তু ছোট খালা, ছোট খালু বা অন্য কেউই সেটা নিয়ে একটুও অস্থির হচ্ছে না। টুম্পা একটু পরে বুঝতে পারল এই দেশে সবাই এভাবেই গাড়ি চালায়। আমেরিকার একজন কল্পনাও করতে পারবে না যে কেউ এভাবে গাড়ি চালাতে পারে। টুম্পা নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল, মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকলো যেন কোনোভাবে কোনো একসিডেন্ট না করে চা বাগানে পৌঁছাতে পারে। যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছে তাতে যদি একসিডেন্ট হয় তাহলে আর কাউকে বেঁচে থাকতে হবে না!

শেষ পর্যন্ত যখন চা বাগানে পৌঁছালো তখন চা বাগান দেখে টুম্পার যত আনন্দ হলো তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ হলো গাড়ি থেকে নামতে পেরে।

গাড়িটা একটা গেস্ট হাউজের সামনে থেমেছে, গেস্ট হাউজটা একটা টিলার উপরে, এখানে দাড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। যতদূর চোখ যায় শুধু চা-বাগান। টুম্পার চা খেতে খুব ভালো লাগে কিন্তু আগে কখনোই চিন্তা করে নি চা আসে কোথা থেকে। টিলার ওপরে দাড়িয়ে চা বাগানটা দেখতে দেখতে টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য!"

সুমি জিজ্ঞেস করল, "কোনটা কী আশ্চর্য?"

"এই চা বাগান। আমি কখনোই ভাবি নি চা বাগান এরকম হয়।"

"তুমি কী ভেবেছিলে?"

"আমি জানি না কী ভেবেছিলাম। মনে হয় ভেবেছিলাম বড় বড় গাছ থেকে টি ব্যাগ ঝুলছে!"

সুমি হি হি করে হেসে বলল, "ভালোই বলেছ টুম্পা আপু।"

গেস্ট হাউজে বেশ কয়েকটা ঘর, একটাতে ঢুকলো টুম্পা আর সুমি অন্যটাতে ছোট খালা, ছোট খালু আর রুমি। রুমি অবশ্যি ঘণ্টাখানেক পরেই নিজের বিছানা বালিশ নিয়ে টুম্পাদের রুমে চলে এল।

গেস্ট হাউজে পৌঁছানোর সাথে সাথেই টেবিলে খাবার দিয়ে দেয়া হয়েছে, অনেক বেলা হয়ে গেছে বলে সবার পেটেই খুব খিদে সে জন্যেই হোক আর ভাল রান্নার জন্যেই হোক সবাই খুব মজা করে খেলো। ছোট খালু বললেন তিনি একটু শুয়ে নেবেন। ছোট খালা বললেন, "সে কী, বেড়াতে এসে ঘুমাবে মানে? ঘুমাতে পারবে না– চল বের হই। এক্ষুণি বের হই। কতো কী আছে দেখার। কতো সুন্দর চা বাগান–"

একটু পর দেখা গেল ছোট খালাই শুয়ে ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছেন, ছোট খালু এপাশ ও পাশ করছেন, তার চোখে ঘুম আসছে না। টুম্পা সুমি আর রুমি তাদের জন্যে অপেক্ষা না করে বের হয়ে গেল। চা বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টুম্পা অবাক হয়ে দেখে চা বাগানের মেয়ে শ্রমিকেরা সারি বেধে চা তুলতে যাচ্ছে। মেয়ে গুলো শুকনো, তাদের মাথায় বড় বড় ঝুড়ি। চা বাগানের মাঝে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে এতো তাড়াতাড়ি চা পাতা ছিঁড়ছে যে তারা দেখে অবাক হয়ে যায়। সুমি ফিস ফিস করে বলল, "টুম্পা আপু।"

"কী?"

"চায়ের বিজ্ঞাপনে এই চা বাগানের ছবি থাকে। সেখানে যে মেয়েরা চায়ের পাতা তুলে তারা হয় নাদুস নুদুস মোটা সোটা। আর এই মেয়েগুলি দেখো কী শুকনা।"

টুম্পা বলল, "এই মেয়েগুলি কাজ করে, যারা কাজ করে তারা কোনোদিন মোটা হতে পারে না। যারা ঘরে বসে বসে খায় তারা মোটা হয়।"

"তা ঠিক।"

টুম্পা, রুমি আর সুমি চা বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেল। এক জায়গায় একটা টিলা শেষ হয়ে গেছে– নিচে একটা শুকনো খাল, খালের ভেতর দিয়ে টলটলে পরিষ্কার পানি তির তির করে বয়ে যাচ্ছে। টুম্পা সুমি আর রুমি খালের পাড়ে একটা গাছের গুড়িতে বসে রইলো। রুমি জিজ্ঞেস করল, "টুম্পা আপু, আমেরিকাতে চা বাগান আছে?"

"উহুঁ। কিন্তু আমেরিকা তো অনেক বড় দেশ সেইখানে পাহাড় আছে, মরুভুমি আছে, সাগর আছে, নদী আছে, জঙ্গল আছে–"

সুমি তার ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলল, "তুমি কখনো মরুভূমিতে গেছো?"

টুম্পা একটু অবাক হয়ে সুমির দিকে তাকালো। এই প্রশ্নটাতে অবাক হবার কী আছে সুমি বুঝতে পারল না, আবার জিজ্ঞাস করলো, "গিয়েছ টুম্পা আপু?"

টুম্পা চোখ বড় বড় করে বলল, "তোমার ঘাড়ে ঐটা কী?"

সুমি ঘাড়ে হাত দেয়, যেখানে চুলকাচ্ছিল সেখানে পিছলে পিছলে এক ধরনের অনুভূতি, মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু এমন জায়গায় চুলকাচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে না। ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী?"

রুমি চিৎকার করে বলল, "নড়ছে! এইটা নড়ছে!"

সুমি তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে দাপাদাপি করতে লাগলো। কাছাকাছি কয়েকটা মেয়ে চায়ের পাতা তুলছিল, চিৎকার শুনে তাদের কয়েকজন ছুটে আসে। বলে, "কী হইছে গো?"

সুমি তখন কোনো কথা বলতে পারছে না, সারা শরীর শক্ত করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। টুম্পা বলল, "ঘাড়ের মাঝে কী যেন হয়েছে-"

কালো মতোন একটা মেয়ে এগিয়ে এসে এক নজর দেখে হি হি করে হেসে বলল, "জোকে ধরিছে!"

"জোঁক! জোঁক!" বলে সুমি এবারে এমন চিৎকার শুরু করে দেয় যে তাকে দেখে মনে হতে থাকে সে বুঝি হার্টফেল করে মরে যাবে!

কালো মতন মেয়েটি হাসতে হাসতে বলে, "এতো ভয় পাও কেন? জোঁকরে ভয় পায় নাকী? তুমি লাফ দিও না আমি জোঁক তুলে দেই-"

সুমি বলল, "প্লিজ-প্লিজ প্লিজ-"

মেয়েটি ঘাড়ে হাত দিয়ে কীভাবে জানি জোঁকটাকে ধরে টেনে খোলার চেষ্টা করল, এমন ভাবে কামড়ে ধরেছে যে টানার সাথে সাথে ইলাস্টিকের মতো লম্বা হতে থাকে কিন্তু ছুটে আসে না! ছেড়ে দিয়ে আবার টেনে ধরতেই এবারে ছুটে এল। জোঁকটাকে নিচে ফেলে পা দিয়ে ডলে পিশে ফেলতেই রক্ত দিয়ে জায়গাটা একটু লাল হয়ে যায়। কালো মতন মেয়েটা বলল, "কতো রক্ত খাইছে দেখো।"

সুমী এতোক্ষণ ভয়ে কাবু হয়েছিল, এইবারে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করে দিলো। মেয়েটা বলল, "কান্দনের কিছু নাই। জোঁকে কামড়ালে কিছু হয় না। আমাদের প্রত্যেক রোজ চাইরটা পাঁচটা কামড়ায়। রক্ত খাইয়া ঢোল হইয়া গড়াইয়া পড়ে আমরা টের পর্যন্ত পাই না।"

এটা শুনেও সুমি খুব ভরসা পেল না, ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতেই লাগলো। টুম্পা বলল, "এখন আর কাঁদছ কেন, জোঁক তো সরিয়েই ফেলেছে!"

"তোমাকে ধরলে তুমিও কাঁদতে।"

টুম্পা বলল, "সেটা মিথ্যা বল নাই! কিন্তু এখন কান্না থামিয়ে এই মেয়েটাকে থ্যাংকস দাও।"

সুমি ফোঁস ফোঁস করে কঁদতে কাঁদতে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী আপু?"

"নাম? আমার?"

"হ্যাঁ?"

"কমলা।"

"কমলা আপু তোমাকে থ্যাংকস। অনেক থ্যাংকস। তার মানে অনেক ধন্যবাদ। তুমি আজকে আমাকে না বাঁচালে আজকে এই জোঁক আমাকে খেয়ে ফেলতো!"

কমলা নামের মেয়েটা হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "কী কথা বলে! এইটাতো একটা জোঁক! এইটাতো বাঘ না! ভাল্লুক না।"

সুমি বলল, "বাঘ ভাল্লুক আমি ভয় পাই না। কিন্তু জোঁক? ও মাগো!"

সবাই চা বাগান থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকায় রওনা দিল পরদিন দুপুর বেলা। এর মাঝে তারা অনেক কিছু করেছে, চা বাগান ঘুরে দেখেছে, চায়ের পাতা তুলে আনার পর ধাপে ধাপে সেটা দিয়ে কী ভাবে চা বানানো হয় সেটা দেখছে, কীভাবে প্যাকেট করে বাক্সে ভরা হয় সেটা দেখেছে। চা শ্রমিকেরা কোথায় থাকে কীভাবে থাকে সেটা দেখেছে, তাদের একটা মন্দির দেখেছে এমন কী শ্মশানে একজনকে পুড়তেও দেখেছে—কিন্তু তারপরেও সারাক্ষণই তাদের কথাবার্তা হলো জোঁককে ঘিরে। সারাক্ষণই সুমি তটস্থ হয়ে ছিল, একটু পরে পরে শরীরের এখানে সেখানে হাত দিয়ে চমকে চমকে উঠছিল। বাসায় ফিরে আসার জন্যে গাড়িতে ওঠার পর শেষ পর্যন্ত তার ভয়টা একটু কমলো।

তারা যখন গাড়ি করে রওনা দিয়েছে তখন অসম্ভব গরম। টুম্পার এরকম গরম দেখে অভ্যাস নেই সে দরদর করে ঘামছে, ছোট খালা এবং ছোট খালুও খবরের কাগজ দিয়ে নিজেদের বাতাস করতে করতে বলছেন, "ইশরে! এ দেখি মানুষ মারা গরম!"

গাড়ি যখন ঘণ্টা খানেক গিয়েছে তখন টুম্পা একটু অবাক হয়ে দেখলো হঠাৎ করে আকাশে মেঘ জমা হতে শুরু করেছে। একটু আগেই আকাশে মেঘের কোনো চিহ্ন ছিল না, এতো তাড়াতাড়ি কেমন করে এরকম মেঘ এসে হাজির হয়েছে কে জানে! দেখতে দেখতে মেঘে আকাশ ঢেকে গেল—কি মিশমিশে কালো মেঘ! টুম্পা অবাক হয়ে দেখে মেঘগুলো জীবন্ত প্রাণীর মতো আকাশে নড়ছে। টুম্পা তার জীবনে এরকম কালো মেঘ দেখে নি! আকাশ চিরে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলক নিচে নেমে এল আর সেই বিদ্যুতের আলোতে পুরো

এলাকাটা যেন ঝলসে উঠলো। একটু পর বজ্রপাতের গুরুগম্ভীর আওয়াজ গুম গুম করে দূর থেকে ভেসে আসে– সেই শব্দটি পুরো মাঠ ঘাট ক্ষেত নদীর ওপর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে যায়।

টুম্পা বলল, "ও মাই গড! কী দৃশ্য! কী অসাধারণ দৃশ্য!"

ছোট খালু বললেন, "এখন এক পশলা বৃষ্টি হবে, দেখবে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে পৃথিবীটা।"

"ছোট খালু গাড়িটা একটু থামাতে বলো না, একটু ভালো করে দেখি!"

সুমি আর রুমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ আব্বু হ্যাঁ। থামাও না।"

ছোট খালু ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন, ড্রাইভার সাথে সাথে রাস্তার পাশে গাড়ি থামালো। ছোট খালু গাড়ির দরজা খুলে দিতেই সবাই দুদ্দাড় করে গাড়ি থেকে নেমে যায়। আকাশের কালো মেঘ আরো মিশমিশে কালো হয়েছে, দিনের বেলাতেই মনে হচ্ছে বুঝি অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে সাথে সাথে মেঘের গর্জন। সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ তার পাশে একটা ছোট নদী। নদীতে একটা ছোট মেয়ে একটা নৌকাকে লগি দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে বিচিত্র একটা থমথমে পরিবেশ, মনে হতে থাকে বুঝি ভয়ানক কিছু ঘটবে। হঠাৎ করে একটা দমকা বাতাস ছুটে এল, শুকনো খড়কুটো পাতা ধূলো বালি উড়তে থাকে। কিছু পাখি তারস্বরে চিৎকার করতে করতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

টুম্পা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তার মাঝে হঠাৎ বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। ছোট খালা চিৎকার করে বললেন, "গাড়িতে! গাড়িতে!"

সুমি বলল, "আম্মু বৃষ্টিতে ভিজি?"

রুমি বলল, "হ্যাঁ আম্মু। প্লিজ?"

টুম্পা অবাক হয়ে ভাবল, মানুষ আবার বৃষ্টিতে কেমন করে ভেজে? ছোট খালা নিশ্চয়ই এরকম পাগলামো করতে দেবেন না, কিন্তু টুম্পা অবাক হয়ে দেখলো ছোট খালা বললেন, "ভিজবি? যা!"

সুমি আর রুমি টুম্পার হাত ধরে আনন্দে চিৎকার করে বলল, "চল টুম্পা আপু! চল!"

সুমি আর রুমির হাত ধরে টুম্পা যখন খোলা মাঠের দিকে ছুটে যেতে লাগলো তখন সে হঠাৎ করে বুঝতে পারলো কেন বৃষ্টিতে ভেজা এতো

আনন্দের। সারা জীবন সে দেখে এসেছে বৃষ্টি মানেই টিপটিপে ঠাণ্ডা মন খারাপ করা স্যাঁতস্যাতে একটা ব্যাপার। অথচ এই বৃষ্টিটি একেবারে উদ্দাম, প্রবল, তীব্র আর সবচেয়ে বড় কথা মোটেও ঠাণ্ডা নয়। বৃষ্টির প্রথম ঝাপটাটা কেটে যাবার পরই পুম্পা অবাক হয়ে দেখলো এটা খুব মজার এক ধরণের বৃষ্টি। ঝমঝমে বৃষ্টি তাদের শরীর ভেসে যাচ্ছে অথচ তাদের ঠাণ্ডা লাগছে না– এটা কী বিচিত্র অনুভূতি!

রুমি আর সুমি নিশ্চয়ই বৃষ্টিতে ভিজে অভ্যস্ত–তারা মাঠে নাচানাচি করে ছুটতে লাগলো, চিৎকার করে গাইত লাগলো "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে...", টুম্পা প্রথমবার বুঝতে পারলো কেন এই দেশের মানুষ বৃষ্টিকে এতো ভালোবাসে! যে বৃষ্টি এতো সুন্দর তাকে কী ভালো না বেসে পারা যায়?

সুমি টুম্পাকে ডাকলো, "আস টুম্পা আপু! আস এখানে নাচি!"

টুম্পার প্রথম প্রথম একটু লজ্জা করছিল কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই লজ্জা ভেঙ্গে সেও ছোটাছুটি করতে লাগলো। চিৎকার করে গান গাইতে লাগলো! টুম্পা অবাক হয়ে দেখলো বৃষ্টির মাঝে ছুটে যেতে যেতে অনেক গুলো বাচ্চা দাঁড়িয়ে গেছে। কয়েকজন বেশ ছোট, গায়ে একটা সূতাও নেই, রুমি সুমি আর টুম্পাকে নাচানাচি করতে দেখে তারা কিছুক্ষণ দাঁত বের করে হাসলো তারপর তারাও নাচানাচিতে যোগ দিয়ে দিলো!

নাচানাচি করতে করতে তারা অনেকদূর চলে গিয়েছিল। হঠাৎ করে শুনতে পেলো তাদের গাড়ির হর্ণ বাজছে– ছোট খালা আর ছোট খালু নিশ্চয়ই ফিরে যেতে ইঙ্গিত করছে!

সুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "চল! আম্মু ডাকছে!"

রুমি বলল, "অরও একটু থাকি! এরকম ফাটাফাটি বৃষ্টি বেশি হয় না।"

সুমি বলল, "ঠিকই হয়। আমরা বিল্ডিংয়ের ভেতরে থাকি তো, তাই টের পাই না।"

টুম্পা বলল, "অনেক মজা হয়েছে। আমি চিন্তাও করি নাই এরকম বৃষ্টির মাঝে ভেজা যায়। আমেরিকায় বৃষ্টিগুলা প্যাঁচপ্যাচ ঠাণ্ডা– পিট পিট করে পড়ে। আধা ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও খালি নাকের ডগাটা ভিজবে। আর এটা কী চমৎকার বৃষ্টি! সারা শরীর পানিতে ভেসে যাচ্ছে!"

আবার হর্ণের শব্দ হলো, তার সাথে এবার ছোট খালার গলা শোনা গেল, চিৎকার করে ডাকছেন।

টুম্পা বলল, "চল যাই।"

সবাই ভিজতে ভিজতে গাড়ির কাছে ফিরে এল, ছোট খালু বললেন, "ভেজা হলো?"

টুম্পা বলল, "জী ছোট খালু এতো মজা জীবনে হয় নাই।"

ছোট খালা বললেন, "এখন ঝটপট মাথা মুছে শুকনো কাপড় পরে নাও, গাড়ির ভেতরে কাপড় বদলাতে পারবে তো?"

টুম্পা বলল, "পারব ছোট খালা।"

কাজটা খুব সহজ হলো না কিন্তু যখন সত্যি সত্যি তিনজনই শুকনো কাপড় পরে বসেছে তখন নিজেদের এতো ঝরঝরে লাগছিল যে সেটা আর বলার মতো নয়। গাড়ি ছেড়ে দেবার সাথে সাথে সুমি বলল, "আম্মু খিদে লেগেছে!"

ছোট খালা বললেন, "খিদে তো লাগবেই, এতো ছোটাছুটি নাচানাচি করলে খিদে লাগবেনা? কী খাবি বল। পরোটা শিক কাবাব নাকি ডালপুরি স্যাণ্ডউইচ? বাবুর্চি সবকিছু তৈরি করে দিয়েছে।"

রুমি "বলল, বাবুর্চি ভাই! জিন্দাবাদ!"

ওরা বাসায় পৌঁছালো রাত সাড়ে বারোটায়। গাড়ি থেকে নেমে উপরে ওঠার সময় সবাই দেখল সিঁড়িতে একজন গুটি গুটি মেরে বসে আছে। টুম্পা একটু অবাক হয়ে এগিয়ে গেল, মানুষটি মাথা তুলে বলল, "টুম্পা?"

টুম্পা অবাক হয়ে দেখলো মানুষটি তার আব্বু।

অভিমান

টুম্পা কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না, অবাক হয়ে আব্বুর দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "আব্বু, তুমি?"

"হ্যাঁ, মা। আমি।"

"তুমি কখন এসেছ?"

"সন্ধ্যেবেলা।"

"কার সাথে এসেছ?"

"কারো সাথে আসি নাই। আমি একা একা এসেছি।"

টুম্পা বিস্ফারিত চোখে বলল, "একা?"

"হ্যাঁ। আমি একা একা এসেছি।"

"কেমন করে এসেছ?"

"এই তো স্কুটারে করে। এসে জিজ্ঞেস করে করে বাসাটা খুঁজে বের করেছি।"

"কিন্তু" টুম্পা কথা বলতে পারে না, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"তুমি তো ঘর থেকেই বের হও না আব্বু।"

আব্বু হাসার চেষ্টা করলেন, সিড়ির কাছে আবছা আলোতে আব্বুর হাসিটাকে খুব বিচিত্র দেখালো, আব্বু বললেন, "কিন্তু আমাকে তো ঘর থেকে বের হতে হবে। হবে না?"

"কেন?"

"তুই বলেছিলি মনে নেই?"

"কিন্তু আমি তো ভুলে বলেছিলাম। ডাক্তার সাহেব বলেছেন—"

"তুই ভুল বলিস নাই। ডাক্তার সাহেব ভুল বলেছে।" আব্বু টুম্পার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আয় মা, টুম্পা। আমার কাছে আয়। আমি খুব কষ্টের মাঝে আছি।"

টুম্পা মাথা ঘুরিয়ে তাকালো, দেখলো তার পিছনে রুমি সুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আরও পিছনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে ছোট খালা আর খালু ও থেমে গেছেন। টুম্পাকে একা কথা বলতে দিয়ে তারা সবাই খুব আস্তে আস্তে উপরে উঠে গেল। আব্বু আবার ডাকলেন, বললেন, "আয় মা টুম্পা, আমার কাছে আয়।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "না আব্বু। না।"

আব্বু কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলেন, "কেন না?"

"আমি এসে তোমার খুব ক্ষতি করেছি আব্বু।"

"কে বলেছে?"

"সবাই বলেছে। ডাক্তার সাহেব বলেছেন।"

"কী বলেছেন ডাক্তার সাহেব?"

"বলেছেন আমি অল্প কয়দিনের জন্যে এসে তোমার সব কিছু ওলট করে দিচ্ছি– তুমি তোমার নিজের একটা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে–"

আব্বু কেমন যেন অবাক হয়ে বললেন, "তুই ওলট পালট করে দিচ্ছিস?"

"হ্যাঁ আব্বু। আমি তোমার কিছু ওলট পালট করতে চাই না–" কথা নাই বার্তা নেই টুম্পা হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

আব্বু একটু অবাক হয়ে টুম্পার কাছে এগিয়ে এলেন, তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তুই কাঁদছিস কেন টুম্পা?"

"ডাক্তার সাহেব বলেছেন তুমি আমাকে দেখে ভয় পাও! আমকে তোমার কাছে যেতে না করেছেন। আমি গেলে তোমার ক্ষতি হবে–"

আব্বু আস্তে আস্তে বললেন, "শোন টুম্পা, আমি অসুস্থ হতে পারি, আমি কিন্তু বোকা না। আমি সব বুঝি–কখনো কখনো ভুল জিনিষ বুঝি, যেটা বোঝার কথা না সেটাও বুঝি। কিন্তু আমি বুঝি। সবাই আমাকে বুঝিয়েছে আমার ঘরের ভেতরে বসে থাকতে হবে। ভয় পেয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে হবে– কারণ আমি বাইরে যেতে পারব না। কিছুতেই বাইরে যেতে পারব না! আর তুই আমাকে কী বলেছিস টুম্পা? তুই বলেছিস আমাকে বাইরে যেতে হবে! আমার ভয়টাকে নিয়ে বাঁচা শিখতে হবে। আমি বসে বসে ভেবেছি। ভেবে ভেবে কী বুঝেছি জানিস?"

"কী আব্বু?"

"ডাক্তারদের কথা ভুল। তোর কথা সত্যি। আমি চোখ খুললেই দেখি আমার চারপাশে কতো কী ভয়ের জিনিষ কিন্তু আমি জানি সেগুলো মিথ্যা! কেন মিথ্যা জানিস?"

"কেন আব্বু?"

"কারণ তুই বলেছিস এ সব মিথ্যা। এতোদিন আমি কারও একটা কথা বিশ্বাস করি নাই– কিন্তু আমি তোর সব কথা বিশ্বাস করেছি।"

টুম্পা চোখ মুছে বলল, "তুমি আমাকে ভয় পাও না আব্বু?"

"ছিঃ মা! নিজের মেয়েকে কেউ ভয় পায়? তুই আয়–আমার কাছে আয়।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "না আব্বু। ডাক্তার সাহেব বলেছেন আমি যেন তোমার কাছে না যাই। আমি গেলে তোমার ক্ষতি হবে।"

আব্বু কেমন জানি আহত গলায় বললেন, "তুই আমার কাছে আসবি না?"

"আমি আসতে চাই আব্বু, কিন্তু আমি জানি আমি যদি আসি তোমার ক্ষতি হবে। আমি যখন চলে যাব কখন তোমার অসুখটা অনেক বেড়ে যাবে। তখন তোমার অনেক কষ্ট হবে কিন্তু কেউ তোমাকে দেখার জন্যে থাকবে না। তুমি একলা একলা কষ্ট পাবে। অনেক বেশি কষ্ট পাবে–" টুম্পা কথা শেষ করার আগে আবার ভেঁউ ভেঁউ করে কেঁদে ফেলল।

আব্বু আস্তে আস্তে বলল, "তুই তাহলে আমার কাছে আসবি না?"

"না।"

আব্বু তখন আস্তে আস্তে সিঁড়ির উপরে বসে গেলেন। দুই হাত দিয়ে মুখ ডেকে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর মুখটা তুলে দুর্বল ভাবে হাসলেন। বললেন, "তুই যাবি মনে করে আমি আজকে আমার বাসাটা পরিষ্কার করেছিলাম। আমি দোকান থেকে তোর জন্যে চিকেন বার্গার কিনে এনেছিলাম।"

টুম্পা ভাঙ্গা গলায় বলল, "আই অ্যাম সরি আব্বু। আই অ্যাম ভেরি ভেরি সরি।"

"তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ ছিল।"

"কী সারপ্রাইজ?"

"মনে আছে তুই আমাকে ছবি আঁকতে বলেছিলি? আমি ছবি আঁকতে পারছিলাম না—"

"হ্যাঁ।"

"আমি শেষ পর্যন্ত ছবি এঁকেছি—"

"সত্যি? সত্যি আব্বু?"

"সত্যি।" আব্বু একটু হাসার চেষ্টা করলেন, বললেন, "অনেকদিন পর ছবি আঁকলাম তো তাই অনেক সময় লেগেছে, কিন্তু মনে হয় শেষ পর্যন্ত যেটা আঁকতে চেয়েছিলাম সেটা আঁকতে পেরেছি। তোকে দেখিয়ে আমি অবাক করে দিতে চেয়েছিলাম!"

আব্বু একটু অপেক্ষা করে বললেন, "টুম্পা মা আমার, তুই সত্যি যাবি না আমার সাথে?"

টুম্পা আর পারল না, আব্বুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। বলল, "যাব আব্বু যাব। যাব।"

সিঁড়ির উপরে ছোটখালা দাঁড়িয়েছিলেন, নিচু গলায় ডাকলেন, "টুম্পা!"

"জি ছোটখালা।"

"যাবার আগে তোর আব্বুকে নিয়ে একটু উপরে আয়, আমরা সবাই মিলে একটু গল্প গুজব করি।"

টুম্পা উঠে দাঁড়িয়ে আব্বুর হাত ধরে বলল, "চল আব্বু।"

এক মুহূর্তের জন্যে আব্বুর মুখে এক ধরনের অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠে। আব্বু জোর করে সেটা সরিয়ে ফেলে বললেন, "চল!"

টুম্পা আব্বুর আঁকা ছবিটার দিকে হতচকিতের মতো তাকিয়ে রইলো। তার মনে হতে লাগলো তার বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে! আমেরিকার কতো আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে সে কতো অসাধারণ পেইন্টিং দেখেছে কিন্তু এই ছবিটার মতো কোনো ছবি কী তাকে এরকম অভিভূত করেছে? ছবিটার দিকে তাকালেই সে বুঝতে পারে এর মাঝে একটা মানুষের বিচিত্র একটা ভাবনার জগৎ লুকিয়ে আছে, যে জগৎটার খোঁজ অন্য কেউ কোনোদিন পাবে না। ছবিটার মাঝে এক ধরণের বিষাদ লুকিয়ে আছে, কী জন্যে লুকিয়ে আছে সে বুঝতে পারে না, শুধু অনুভব করতে পারে।

টুম্পা আব্বুর হাত ধরে বলল, "আব্বু, তুমি এতো সুন্দর ছবি আঁকতে পার?"

আব্বু বাচ্চা ছেলের মতো খুশি হয়ে উঠে বললেন, "ভালো লেগেছে তোর?"

"অ-স-ম্ভ-ব ভালো লেগেছে আব্বু। অ-স-ম্ভ-ব ভালো! তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর্টিস্ট।"

"ধুর বোকা মেয়ে!"

"আমি বোকা না আব্বু! আমি ভালো ছবি আর খারাপ ছবি বুঝি। পৃথিবীতে বিখ্যাত ছবি আছে আর ভালো ছবি আছে। সব বিখ্যাত ছবি ভালো না আর সব ভালো ছবি বিখ্যাত না! তোমার এটা ভালো ছবি আব্বু অসম্ভব ভালো ছবি।"

আব্বু আবার বললেন, "ধুর বোকা মেয়ে।"

টুম্পা বলল, "আব্বু তুমি আর ছবি আঁকবে না?"

"আঁকব।"

"আঁকো আব্বু, আমি দেখি তুমি কেমন করে আঁকো।"

"তুই দেখবি?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ আব্বু।" একটু পর আব্বুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আব্বু—"

"কী, মা?"

"তুমি আমাকে ছবি আঁকতে শেখাবে।"

"তুই ছবি আঁকা শিখতে চাস?"

"হ্যাঁ আব্বু। আমি বড় হয়ে তোমার মতোন একজন আর্টিস্ট হতে চাই।"

আব্বু টুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "দেখিস তুই আমার থেকেও বড় আর্টিস্ট হবি।"

"ঠিক আছে দেখব। কিন্তু এখন তুমি আরেকটা ছবি আঁকো। আমি দেখব।"

আব্বু তখন ইজেলে একটা ক্যানভাস বসিয়ে আরেকটা ছবি আঁকতে শুরু করলেন। টুম্পা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে—আব্বুর হাতের ছোঁয়ায় সাদা ক্যানভাসটি কী অপূর্ব একটা ছবি হয়ে উঠতে থাকে। টুম্পার কাছে মনে হয় কেউ যেন তার হাত ধরে একটা স্বপ্নের জগতে নিয়ে যাচ্ছে, যতই সামনে যাচ্ছে ততই সেটা রূপকথার জগতের মতো তার সামনে খুলে যাচ্ছে।

ছবিটা শেষ করে আব্বু আরেকটা ছবি আঁকলেন, তারপর আরেকটা। তারপর আরেকটা। তারপর আঁকতেই থাকলেন।

দুই সপ্তাহ পর আব্বুর ছোট বাসার মাঝে একুশটা এক্রেলিকের ছবি জমা হয়ে গেল, একটি থেকে আরেকটা বেশি সুন্দর, বেশি রহস্যময়। টুম্পা তখন তার আব্বুর হাত ধরে বলল, "আব্বু।"

আব্বু বললেন, "কী মা?"

"তোমার ছবির একটা এক্সিবিশান করি?"

আব্বু হা হা করে হাসলেন, বললেন, "ধূর বোকা মেয়ে এই এক্রেলিক পেইন্টের ছবি কে দেখবে। এগুলো ছেলেমানুষী ছবি।"

টুম্পা বলল, "আব্বু আমাকে তুমি ছোট বাচ্চা পাও নি। আমি ভালো ছবি আর খারাপ ছবি বুঝি। তোমার এই ছবিগুলোর এক্সিবিশান করে আমরা গ্যালারিতে দিয়ে দেব।"

আব্বু হাসলেন, বললেন, "ধূর বোকা! এই ছবি গ্যালারিতে দিয়ে কী হবে?"

টুম্পা অবশ্যি অসাধ্য সাধন করে ফেলল। ধানমণ্ডিতে একটা গ্যালারি ভাড়া করলো— ছোট খালু সেটার জন্যে সাহায্য করলেন। ছবি প্রদর্শনীর জন্যে একটা কার্ড ছাপানো হলো, আব্বু নিজেই সেটা ডিজাইন করে দিলেন, ছাপানোর কাজে সাহায্য করলেন ছোটখালা। টুম্পা সুমিকে নিয়ে সেই কার্ডগুলো সবার মাঝে বিতরণ করলো এখানে সাহায্য করলো ছোটখালার ড্রাইভার। খবরের কাগজের অফিসে যখন কার্ডগুলো বিলি করতে যাচ্ছিল তখন একটা মজার ঘটনা ঘটলো।

গেটে একজন দারোয়ান তাদের থামালো, জিজ্ঞেস করলো, কার সাথে দেখা করতে চায়। টুম্পা কিংবা সুমি—পত্রিকার অফিসের কাউকেই চেনে না তাই আমতা আমতা করে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করল, একটা ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে তারা তার দাওয়াতের কার্ড দিতে এসেছে। দারওয়ান বলল, তার হাতে দিয়ে যেতে সে পৌছে দেবে, টুম্পা দিয়ে যেতে চাচ্ছিল সুমি রাজী হলো না, সে ভেতরে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চেহারার কারো হাতে দিতে চায়।

যখন এসব নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হচ্ছে ঠিক তখন মাঝ বয়সী একজন মানুষ অফিস থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল সে থামলো, জিজ্ঞেস করলো, "কী হয়েছে?"

সুমি বলল, "আমরা একটা দাওয়াতের কার্ড দিতে এসেছি—ইনি ভিতরে যেতে দিচ্ছেন না।"

দারওয়ান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মানুষটি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কিসের দাওয়াত? বিয়ে না জন্মদিন?"

টুম্পা বলল, "না। ছবির এক্সিবিশান।"

"ও!" মানুষটার চোখে একটু কৌতূহল ফুটে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "কার ছবি?"

টুম্পা বলল, "বুলবুল রায়হানের সলো এক্সিবিশান।"

মানুষটা মনে হলো একটা ইলেকট্রিক শক খেয়ে গেল, বলল, "কার ছবি?"

"বুলবুল রায়হান।"

"বুলবুল রায়হান বেঁচে আছে? শুনেছিলাম সুইসাইড করেছে—"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমার আব্বু মোটেই সুইসাইড করেন নি। আব্বু বেঁচে আছেন, ছবি আঁকছেন।"

মানুষটি চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি বুলবুল রায়হানের মেয়ে।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"আমি শুনেছিলাম বুলবুল রায়হানের ওয়াইফ তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ আমি আমেরিকা থেকে এসেছি।"

"কিন্তু কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

মানুষটা ইতস্তত করে বলল, "আমি যতদূর জানতাম বুলবুল রায়হান পাগল হয়ে গিয়েছিল—"

টুম্পা মুখটা শক্ত করে বলল, "আব্বুর স্কিৎজোফ্রেনিয়ার একটু সমস্যা আছে।"

"তাহলে?"

এবারে সুমি বলল, "মেজো খালুর অনেক বড় সমস্যা ছিল, কোনো ডাক্তার ভালো করতে পারে নি। টুম্পা আপু এসে দুই সপ্তাহের মাঝে ভালো করে ফেলেছে—"

"কীভাবে?"

সুমি রহস্যের ভান করে বলল, "ম্যাজিক!"

মানুষটা একবার সুমির দিকে আরেকবার টুম্পার দিকে তাকালো তারপর বলল, "এটা দিয়ে অসম্ভব ভালো একটা স্টোরি হয়।"

টুম্পা বুঝতে পারল না, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়?"

"খবরের কাগজের একটা নিউজ হয়।" মানুষটা টুম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী খুব ব্যস্ত?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"তাহলে তুমি একটু ভেতরে আস। তোমার একটা ইন্টারভিউ নেই। তারপর ক্যামেরাম্যান নিয়ে যাব বুলবুল রায়হানের কাছে, তার একটা ইন্টারভিউ নেব চমৎকার একটা স্টোরি হবে। হার্ট টাচিং স্টোরি—"

খবরের কাগজের এই স্টোরির জন্যেই কী না কে জানে এক্সিবিশান দেখার জন্যে সত্যি সত্যি অসংখ্য মানুষ চলে এল। পত্রপত্রিকার অনেক সাংবাদিক, তার সাথে সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান। গ্যালারির ভেতরে ছবিগুলো টানানো হয়েছে। একটা লাল ফিতে টানানো হয়েছে, সেটা কেটে সবাই ভেতরে ঢুকবে। আব্বু একটা জিনসের প্যান্টের উপর একটা ফতুয়া পরেছেন। তাকে দেখতে এতো সুন্দর দেখাচ্ছে যে টুম্পা চোখ ফেরাতে পারে না। ছোটখালা সেজেগুজে এসেছেন, ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন, অতিথিদের দেখে ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন, "কতো লোক আর সাংবাদিক এসেছে দেখেছিস? দেশি মানুষ থেকে বিদেশিই তো বেশি! আর দেরি করে লাভ নেই, ফিতে কেটে ভেতরে ঢুকে যাওয়া যাক।"

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "ফিতে কাটবে কে?"

ছোটখালা মাথা চুলকে বললেন, "একজন প্রধান অতিথি বানানো উচিৎ ছিল! প্রধান অতিথি সবসময় ফিতে কাটে!"

"বানাও নাই?"

"না, ভুলে গেছি।"

সুমি বলল, "তাহলে কী হবে?"

টুম্পা বলল, "আমার মাথায় একটু বুদ্ধি এসেছে।"

"কী বুদ্ধি?"

"তুমি আমাদের প্রধান অতিথি। তুমি ফিতে কাটবে—"

ছোটখালা চোখ কপালে তুলে বললেন, "ধূর গাধা! আমি ফিতে কাটব কেমন করে—"

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। টুম্পা সবার সামনে গিয়ে প্রথমে বাংলায় তারপর ইংরেজিতে ঘোষণা করে দিয়েছে যে ছোটখালা ফিতে কেটে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন! ছোটখালার এতো সাংবাদিক এতো টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে লজ্জায় লাল নীল বেগুনি হয়ে ফিতে কাটলেন। সবাই গ্যালারির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল টেলিভিশনের ক্যামেরা কাঁধে একজন সবাইকে থামালো, বলল, "শিল্পী কিছু বলবেন না?"

আব্বু বললেন, "না! আমি কিছু বলব না।"

একজন সাংবাদিক বলল, "না, না, শিল্পীকে কিছু বলতে হবে। সবসময় বলে। বলেন কিছু একটা।"

আব্বু বললেন, "কী বলব?"

"কেমন করে ছবি আঁকলেন এইসব।"

আব্বুকে প্রথমে একটু অসহায় দেখায় কিন্তু বেশ তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন। হাত দিয়ে মাথার চুলকে সোজা করতে করতে বললেন, "আসলে আজকে এখানে এই সলো এক্সিবিশান হওয়ার কথা ছিল না। আমি আসলে একজন অসুস্থ মানুষ। আপনারা আপনাদের চারপাশে যা কিছু দেখেন আমি সেগুলো দেখি না—আমি অন্য কিছু দেখি। সেগুলো ভয়ের, সেগুলো দুঃখের এবং মাঝে মাঝে সেগুলো আতংকের। সেই ভয় থেকে বাঁচার জন্যে আমি একটা অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে থাকতাম। সেই ভয় থেকে আমি মুক্তি পেতাম না কিন্তু আমি ভাবতাম আমার আর কিছু করার নেই!

"তখন আমার মেয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করেছে। বড় বড় ডাক্তারেরা যেটা পারে নি আমার মেয়ে সেটা করতে পেরেছে। সেই ভয়টাকে মেনে নিয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে শিখিয়েছে। আবার নতুন করে ছবি আঁকতে শিখিয়েছে। তাই এই সলো এক্সিবিশানটা আসলে আমার নয়। এটি আমার মেয়ে টুম্পার। এই গ্যালারির দেয়ালে টানানো এগুলো ছবি নয়—এগুলো হচ্ছে আমার মেয়ের জন্যে আমার ভালোবাসা! আর কিছু নয়।"

আব্বুর কথা শুনে টুম্পার চোখে পানি এসে গেল, অনেকগুলো টেলিভিশন ক্যামেরা তার দিকে তাক করে ছিল বলে সে তার চোখ মুছতে পারল না।

ঘণ্টাখানেক পর ছোটখালা খুব ব্যস্ত হয়ে টুম্পার কাছে এলেন, বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে!"

টুম্পা ভয় পেয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

'বিদেশিগুলো ছবি কিনতে চাইছে। আমরা তো দাম বসাই নি। আমাকে দাম জিজ্ঞেস করছে!"

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কতো বলেছ?"

"আমি কিছু বলার আগেই বলল, এক হাজার ডলার করে দেবে। পাঁচটা কিনবে! কী মনে হয় তোর?"

টুম্পা হাসল, "বলল, আমি জানি না। তুমি ছোটখালুর সাথে কথা বলে ঠিক করো।"

ছোটখালা বললেন, "সেটাই ভালো।"

ছোটখালা ভীড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। টুম্পা তার আব্বুকে খুঁজে বের করার জন্যে এদিক-সেদিক তাকালো, তার এই আব্বুটিকে সে আবিষ্কার করেছে। সে একা—আর কেউ নয়। এই আব্বুটিও এখন শুধু তার একার। আর কারো নয়।

বৃষ্টি

ছোট খালা বললেন, "টুম্পা তোর টেলিফোন। তোর আম্মু আমেরিকা থেকে।"

টুম্পা অনেকগুলো খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল, আব্বুর এক্সিবিশান নিয়ে যে খবর বের হয়েছে সেগুলো সে কেটে কেটে রাখছে। কাঁচিটা রেখে সে টেলিফোন ধরতে গেল, কানে লাগিয়ে বলল, "হ্যালো।"

অন্য পাশ থেকে আম্মুর গলা না শুনে সে শুনলো লিটনের গলার স্বর। চিৎকার করে বলছে, "আপু! তোমাকে আমরা টেলিভিশনে দেখেছি! টেলিভিশনে দেখেছি!"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ আপু! তুমি কথা বলছ! অনেক মানুষ—সেখানে। কী সুন্দর—ইশ আপু, তুমি আমাকে নিয়ে গেলে না কেন?"

"পরের বার তোকে নিয়ে আসব আমি, দেখবি কী মজা হবে। এখানে যা মজার বৃষ্টি হয় তুই না দেখলে বিশ্বাস করবি না—"

"আমাদের এখানেও বৃষ্টি হয়েছে আপু—" লিটন এরপর সেখানকার অনেক খুটিনাটি খবর দিতে শুরু করল। লিটনের কথা সহজে শেষ হতো বলে মনে হয় না মাঝখানে আম্মু টেলিফোনটা নিয়ে টুম্পার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন, "টুম্পা তোর কী খবর?"

"ভালো আম্মু।"

"তোকে আমরা টেলিভিশনে দেখেছি। আমি জানতাম না তুই তোর আব্বুকে খুঁজে পেয়েছিস।"

"হ্যাঁ আম্মু।"

"আমাকে তো কিছু বলিস নি—"

"কীভাবে বলব বুঝতে পারছিলাম না। অনেক কিছু হয়েছে এখানে, তাই ঠিক করেছিলাম এসে বলব। তোমরা যে টেলিভিশনে দেখে ফেলবে বুঝি নি আম্মু!"

"হ্যাঁ। আজকাল সব দেখা যায়।" আম্মু একটু অপেক্ষা করে বললেন, "কেমন আছে বুলবুল? টেলিভিশনে তো ভালোই দেখলাম—"

"এখন ভালোই আছেন। প্রথম যখন খুঁজে পেয়েছিলাম তখন খুব ভয়ংকর অবস্থা ছিল। তুমি চিন্তা করতে পারবে না!"

আম্মু বললেন, "আমি জানি। আসলে—"

"আসলে কী?"

"মানুষটাকে ছেড়ে চলে আসা ঠিক হয় নি। সমস্যা ছিল আমি সেটা ফেস করার সাহস পাই নি। ভয় পেয়েছিলাম—"

"তুমি কোনোদিন আমাকে কিছু বল নি।"

"হ্যাঁ বলি নি। কী বলব? বলতে খারাপ লাগতো, লজ্জা লাগতো—তখন বয়স কম ছিল, কী করতে হবে বুঝি নাই—" আম্মুর গলা হঠাৎ ভেঙে গেল।

টুম্পা বলল, "আম্মু! তুমি আপসেট হয়ো না। প্লিজ—"

"এখন মনে হচ্ছে আমার আরেকটু চেষ্টা করা উচিৎ ছিল। আমি করি নাই। ছেড়ে চলে এসেছি। সেলফিশের মতো কাজ করেছি।"

"থাকুক আম্মু। এসব নিয়ে পরে কথা বলব।"

"ঠিক আছে।" আম্মু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তোর তো চলে আসার সময় হয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ আম্মু আর দুই দিন।"

"তুই চলে এলে বুলবুল একটু মন খারাপ করবে না?"

টুম্পা বলল, "আমি সেই কথাটা এখন চিন্তা করতে চাই না আম্মু।"

টুম্পা আরো কিছুক্ষণ তার আম্মুর সাথে কথা বলল, ফোন রেখে দেবার আগে আম্মু বললেন, "তোর সেই টিচার সেদিন ফোন করেছিল। মিসেস হেনরিকসন।"

"কেন আম্মু?"

"জানি না। তোকে খুঁজছে, খুব নাকী দরকার। তোর ছোটখালার নম্বর নিয়েছে—ফোন করবে মনে হয়। তার নাম্বারটাও দিয়েছে। লিখে নিবি?"

"আমার কাছে মিসেস হেনরিকসনের নাম্বার আছে।"

"ঠিক আছে তাহলে। খোদা হাফেজ।"

"খোদা হাফেজ আম্মু।"

পরদিন রাতে মিসেস হেনরিকসন ফোন করলেন। টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "কী খবর মিসেস হেনরিকসন। তুমি বাংলাদেশে আমাকে খুঁজে বের করে ফেলেছ?"

মিসেস হেনরিকসন বললেন, "এখন পৃথিবীটা কতো ছোট হয়ে গেছে! বাংলাদেশ আর আমেরিকা এখন কী দূরে নাকি? পুরো পৃথিবী এখন একটা দেশের মতো। যে কোনো মানুষ যে কোনো দেশে থাকতে পারে।"

টুম্পা ভদ্রতা করে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ।"

"এখন সব সময় উচিৎ এক দেশের মানুষের অন্য দেশে যাওয়া। অন্য দেশে থাকা। তাহলে পৃথিবীর সব মানুষ মিলে একটা জাতি হতে পারবে।"

টুম্পা আবার ভদ্রতা করে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ মিসেস হেনরিকসন!"

"যাই হোক, আমি অবশ্যি তোমার সাথে ফিলোসফি নিয়ে আলাপ করার জন্যে এই দুপুর রাতে ফোন করি নি। অন্য একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্যে ফোন করেছি।"

"কী বিষয় মিসেস হেনরিকসন।"

"এই এলাকায় সামারে থাকার জন্যে একজন আর্টিস্ট এসেছেন। মিস্টার কিম্বার্লী। খুব ভালো আর্টিস্ট, বিখ্যাত না কিন্তু ভালো। আমার সাথে কয়দিন আগে দেখা হয়েছিল—যারা ছবি আঁকতে পছন্দ করে তাদেরকে সময় দিতে রাজী হয়েছেন। নানারকম টেকনিক শেখাবেন—সত্যিকার আর্টিস্ট কেমন করে আঁকে, কেমন করে চিন্তা করে এই সব।"

টুম্পা খুকখুক করে হেসে বলল, "মিসেস হেনরিকসন! তুমি বিশ্বাস করবে না এখানে কী হয়েছে!"

"কী হয়েছে?"

"আমি একজন বিখ্যাত আর ভালো আর্টিস্টের সাথে সময় কাটাচ্ছি। সে অনেকগুলো ছবি এঁকেছে, আমি দেখেছি। আমাকে একেবারে হাতে ধরে ছবি আঁকা শিখিয়েছে!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ!"

"তাহলে তো হলোই! তুমি তাহলে শুধু শুধু এখানে ফিরে আসতে চাইছ কেন। থেকে যাও।"

টুম্পা বলল, "আমার মাঝে মাঝে তাই ইচ্ছে করে, কিন্তু আসতে তো হবেই।"

মিসেস হেনরিকসন আরো কিছুক্ষণ টেলিফোনে কথা বলে টেলিফোন রেখে দিলেন। সুমি বলল, "তোমাদের টিচাররা কী সুইট, একেবারে আমেরিকা থেকে ফোন করে তোমার খোঁজ নেন!"

"সবাই না। শুধু মিসেস হেনরিকসন! মিসেস হেনরিকসন অন্যরকম টিচার।"

দেখতে দেখতে টুম্পার ফিরে যাওয়ার দিন চলে এল। বিকেল বেলা ফ্লাইট দুপুরে সবাই একসাথে শেষবারের মতো খেতে বসেছে। ছোটখালা বললেন, "আজকে দুপুরে তুই তোর বাবার সাথে থাকলেই পারতি!"

"গত কয়েকদিন তো ছিলামই। আজকের দিনটা আমি তোমাদের সাথে কাটাতে চাইছিলাম।"

ছোটখালা বললেন, "তুই এসে শুধু কষ্টই করে গেলি! তোকে ভালো মন্দ কিছু খাওয়াতেও পারলাম না।"

"কী বল ছোট খালা। আমি এসেছিলাম শুকনো পাতলা, ফিরে যাচ্ছি নাদুসনুদুস গোলগাল! পাশপোর্টের ছবির সাথে মিলবে না, ইমিগ্রেশন না আটকে দেয়!"

সুমি বলল, "তাহলে তো ভালোই হয়। তোমাকে আর কোনোদিন যেতে হবে না। তুমি এখানে থেকে যাবে!"

"আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না।"

রুমি বলল, "তুমি আবার কবে আসবে?"

"প্লেনের ভাড়া জোগাড় করলেই চলে আসব।"

ছোট খালা মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ সবাইকে নিয়ে চলে আসবি। অনেকদিন তোর মা'কে দেখি না। বাচ্চাটাকে তো দেখিই নাই।"

টুম্পা বলল, "আমরা আসলে তো তোমাদের আরও কতো ঝামেলা।"

সুমি বলল, "কে বলেছে ঝামেলা, কতো মজা হয়।"

"কী মজাটা হয়েছে? সবাই মিলে রাঙ্গামাটি বান্দরবান যাবার কথা ছিল, গিয়েছি?" টুম্পা বলল, "আমার জন্যে তোদের কোথায় যাওয়া হলো না।"

সুমি বলল, "কিন্তু তার বদলে আমরা মেজো খালুর ছবি প্রদর্শনী করেছি! কী মজা হয়েছিল মনে আছে?"

রুমি বলল, "হ্যাঁ। মেজো খালু তার একটা ছবি দিয়ে দিলেন আমাদেরকে! সেইটা বিক্রি হলো দেড় লাখ টাকায়! আমাদের তিনজনের একেকজনের পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবার কথা। আম্মুর জন্যে সেটা পেলাম না—একেজন পেলাম মাত্র পাঁচশো টাকা!"

"এই ছোট বাচ্চা এতো টাকা দিয়ে কী করবি!"

ছোট খালু বললেন, "বুলবুলের তো কোনো প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান নেই! তাকে দেখে শুনে রাখতে হবে—সে দিলেই তোরা নিবি কেন?"

রুমি চোখ বড় বড় করে বলল, "চিন্তা করতে পার? পঞ্চাশ হাজার টাকা! তার বদলে পেলাম মাত্র পাঁচশ টাকা।"

সুমি বলল, "ভালো করে ছবি আঁকা শিখে নে, তাহলে তোর ছবিও একদিন লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হবে।"

টুম্পা বলল, "ভ্যানগগের একটা ছবি বিক্রি হয়েছিল পয়ষট্টি মিলিয়ন ডলারে।"

ছোট খালু রুমিকে বললেন, "ভ্যানগগ তার কান কেটে বান্ধবীকে উপহার দিয়েছিলেন। তুই পারবি তোর কান কেটে উপহার দিতে? আছে কোনো বান্ধবী?"

"তার চাইতে আমি মেজো খালুর এসিস্টেন্ট হয়ে যাব। বাটিতে রং গুলে দেব, তুলি গুলো ধুয়ে রাখব। মেজো খালু খুশি হয়ে মাঝে মধ্যে আমাকে একটা ছবি দিবেন, আমি সেইটা বিক্রি করেই বড় লোক হয়ে যাব।"

সুমি হি হি করে হেসে বলল, "এই আইডিয়াটা খারাপ না!"

টুম্পা বলল, "রুমি অলরেডি আব্বুর জন্যে অনেক কাজ—করেছে। মনে আছে এক্সিবিশনের দিনগুলিতে সে কতো সুন্দর করে সবার কাছে ক্যাটালগ দিয়েছে!"

রুমি বলল, "আমি এতো পরিশ্রম করলাম অথচ আমাকে একবারও টেলিভিশনে দেখালো না। দেখালো আম্মুকে! এই পৃথিবীতে কোনো বিচার নাই।"

সুমি বলল, "আরে গাধা। সেদিন আম্মু ছিল চিফ গেস্ট। চিফ গেস্টকে দেখাবে না তো কী তোকে দেখাবে?"

ছোট খালু বললেন, " তোদের আম্মু পরিশ্রম করে নাই কে বলেছে? অনেক পরিশ্রম করেছে।"

সুমি আর রুমি এক সাথে প্রতিবাদ করল, "কী পরিশ্রম করেছে আম্মু?"

"কতো পরিশ্রম করে সেজেছিল মনে আছে? আমাদের বিয়ের দিনও এরকম সাজ দেয় নাই!"

ছোটখালা প্রতিবাদ করে কিছু বলতে চাইছিলেন, টুম্পা তাকে সুযোগ না দিয়ে বলল, " ছোট খালাকে টেলিভিশনে কী সুন্দর লাগছিল মনে আছে? একেবারে সিনেমার নায়িকার মতো!"

ছোটখালু বললেন, "থাক থাক এইভাবে বল না। এমনিতেই বাসায় থাকতে পারি না। এইভাবে বললে আর দেশেই থাকতে পারব না। তোমার সাথে আমাদের আমেরিকা চলে যেতে হবে!"

সুমি হঠাৎ করে বলল, "ইশ টুম্পা আপু! তুমি সত্যিই চলে যাবে!"

টুম্পা কিছুক্ষণ সুমির দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখ সুমি আমি যখন যাব তখন কিন্তু নো কান্নাকাটি। সবাই হাসবে। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"তোমাদের কেউ যদি একটুও মন খারাপ করো তাহলে আমি কিন্তু একেবারে হাঁউমাউ করে কাঁদতে থাকবো—তখন তোমরাই বিপদে পড়ে যাবে! আমি কিন্তু খুব অল্পতেই কেঁদে ফেলি।"

ছোট খালাও মুখ কালো করে বললেন, "আমিও।"

সুমি বলল, "আমিও।"

ছোট খালু বললেন, "মনে হচ্ছে এটা তোমাদের বংশগত সমস্যা।"

সুমি বলল, "আব্বু এটা সমস্যা না, এটা হচ্ছে গুণ। এর অর্থ আমাদের মন খুব নরম। বুঝেছ?"

আব্বু বললেন, "বুঝেছি।"

ছোটখালা হঠাৎ একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এবং তখন একসাথে সবাই চুপ করে গেল। হঠাৎ করে কেউ বলার মতো আর কোনো কথা খুঁজে পেলো না। সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো যে অন্য কেউ একটা কথা বলবে কিন্তু কেউই কিছু বলল না। সবাই চুপ করে বসে রইল।

এয়ারপোর্টে ছোটখালা, ছোটখালু রুমি সুমির কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় কেউ কাঁদল না। সবাই ভান করতে লাগলো পুরো বিষয়টা একটা মজার বিষয় এবং তারা বিনা কারণে হাসতে লাগলো। ছোটখালা টুম্পাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে চুমু খেলেন তারপর ফিস ফিস করে বললেন, "আমরা এখন যাই। তুই তোর আব্বুর কাছে যা। মানুষটা একা একা দাঁড়িয়ে আছে।"

টুম্পা বলল, "ঠিক আছে ছোটখালা।"

সবাই চলে যাওয়া পর্যন্ত টুম্পা অপেক্ষা করল তারপর সে তার আব্বুর কাছে গেল। আব্বু এক কোণায় দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে তার গাল ঘষছিলেন। সকালে মনে হয় শেভ করেন নি, সেজন্যে মুখে ছোট ছোট দাড়িতে একটা নীলচে আভা এসেছে। আব্বুর এমনিতেই চুল আচড়াতে মনে থাকে না, চুলগুলো এলোমেলো, একটা আধময়লা ফতুয়া আর রং ওঠা জিনসের প্যান্ট পরে আছেন, তারপরেও তাকে একজন রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছে। এতো সুন্দর একটা মানুষকে ছেড়ে তার আম্মু কেমন করে চলে গিয়েছিলেন?

টুম্পা আব্বুর কাছে গিয়ে ডাকলো, "আব্বু।"

আব্বু যেন একটু চমকে উঠে টুম্পার দিকে তাকালেন, "টুম্পা!"

"হ্যাঁ আব্বু।"

"তুই তুই তাহলে সত্যিই চলে যাচ্ছিস।"

"হ্যাঁ আব্বু।"

"এখন মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে—"

"কী মনে হচ্ছে?"

আব্বু মাথা নাড়লেন, বললেন, "নাহ্! কিছু না।"

"বল আব্বু কী বলতে চাচ্ছ।"

"মনে হচ্ছে তুই না এলেই ভালো ছিল। তাহলে আমি জানতামই না তুই আছিস! আমি যেরকম ছিলাম সেরকম থাকতাম—"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "না আব্বু। তাহলে আমি কোনোদিন তোমাকে দেখতেই পেতাম না।"

"কিন্তু এখন যে খুব মন খারাপ লাগছে।"

"আমারও খুব মন খারাপ হচ্ছে কিন্তু আব্বু তোমাকে শক্ত হতে হবে।"

আব্বু মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ আমি শক্ত আছি।"

"আমি আবার আসব আব্বু। প্লেনের ভাড়া জোগাড় হলেই চলে আসব।"

"ও আচ্ছা!" আব্বুর হঠাৎ করে কী যেন মনে পড়ল, পকেট থেকে একটা খাম বের করে টুম্পার হাতে দিলেন। বললেন, "নে।"

"এটা কী?"

"এক্সিবিশনের ছবিগুলি থেকে যে টাকাটা এসেছে সেইটা ডলারে করে দিয়েছি। তোর আর প্লেনের টাকার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না।"

"এই খানে কতো ডলার আছে?"

"গুণি নাই। পাঁচ ছয় হাজার হবে।"

টুম্পা চোখ কপালে তুলে বলল, "পাঁচ ছয় হাজার ডলার? সর্বনাশ! এতো টাকা নিয়ে আমাকে যেতে দেবে না।"

"দেবে দেবে।" আব্বু বললেন, "এটা কী তুই চুরি করে নিচ্ছিস যে নিতে দেবে না?"

"সবকিছুর একটা নিয়ম আছে—"

আব্বু হাত নেড়ে পুরোটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমি কী নিয়ম ভেঙে তোকে টাকা দিচ্ছি? বাবা মেয়েকে টাকা দিতে পারবে না এটা কোন দেশি নিয়ম?"

"আব্বু তুমি বুঝতে পারছ না—"

"আমি ঠিকই বুঝতে পারছি, তুই বুঝতে পারছিস না।"

টুম্পা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে আমি এক হাজার ডলার নিয়ে যাই—একটা টিকেটের দাম।"

"উহুঁ।" আব্বু মাথা নাড়লেন, "আমি এখানে টাকা দিয়ে কী করব?"

"তোমার একটা টেলিফোন কিনতে হবে। আমি প্রতিদিন তোমার সাথে কথা বলব।"

"ঠিক আছে কিনব।"

"আর একটা কম্পিউটার কিনবে। তার সাথে ইন্টারনেটের কানেকশান। তাহলে আমি তোমাকে দেখতে পাব, তুমি আমাকে দেখতে পাব। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"সে জন্যে টাকাগুলো রাখ।"

আব্বু বললেন, "আমার সেজন্যে টাকা আছে।"

টুম্পা বলল, "কিন্তু আব্বু—"

আব্বু একটু আহত গলায় বললেন, "টুম্পা তুই এমন করছিস কেন? এই পৃথিবীতে তুই ছাড়া আমার আর কে আছে? তোকে যদি না দিই তাহলে আমি কাকে দিব? তুই না-না করিস না তো। এমনিতেই আমার মন ভালো নেই, তুই আরো মন খারাপ করে দিচ্ছিস।"

টুম্পা একটু থতমত খেয়ে বলল, "ঠিক আছে আব্বু।" টুম্পা প্যাকেটটা ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল, "থ্যাংকু আব্বু। অনেক থ্যাংকু।"

আব্বু কোনো কথা বললেন না। কেমন যেন আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, টুম্পার দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু দেখে মনে হয় আব্বু যেন ঠিক দেখছেন না। টুম্পা ডাকলো, "আব্বু।"

"হ্যাঁ মা।"

"আমি প্রতিদিন তোমার সাথে কথা বলব আর প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখব।"

"ঠিক আছে।"

"তোমাকে কিন্তু উত্তর দিতে হবে। দিবে তো?"

"দিব।"

"আর তোমাকে ছবি আঁকতে হবে। বলেছ না যে বিশাল একটা ওয়েল পেইন্টিং করবে—সেটা শুরু করবে।"

"শুরু করব।"

"ওষুধ খেতে ভুলবে না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"আমি কিন্তু খোঁজ নেব।"

"ঠিক আছে।"

টুম্পা তার আব্বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি এখন যাই?"

আব্বু টুম্পাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। টুম্পা বলল, "যাই আব্বু?"

আব্বু ভাঙা গলায় বললেন, "যা।" কিন্তু টুম্পাকে যেতে দিলেন না, তাকে ধরে রাখলেন। টুম্পা খুব সাবধানে আব্বুর হাত সরিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো, সে আব্বুর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না, তার শুধু মনে হচ্ছিল আব্বুর মুখের দিকে তাকালেই সে বুঝি ঝরঝর করে কেঁদে দেবে। টুম্পা

আব্বুর হাত ধরে ফিস ফিস করে বলল, "আবার দেখা হবে আব্বু।"

তারপর আব্বুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সামনে হেঁটে যেতে থাকে। চেকিং কাউন্টারের সামনে মানুষের লম্বা লাইন, টুম্পা সবার পিছনে দাঁড়িয়ে দেখলো আব্বু তখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে তার চারপাশে কী হচ্ছে আব্বু কিছুই বুঝতে পারছে না।

মুখ ঘুরিয়ে টুম্পা তখন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। পিছনে দাঁড়ানো একজন বিদেশি মহিলা সেটা দেখতে পায় নি এরকম ভান করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

মিনিট দশেক পর টুম্পা ইমিগ্রেশানের লাইনে দাঁড়িয়েছে, বুকের ভেতর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, মনে হচ্ছে সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, স্বপ্নের দৃশ্যগুলো সে দেখছে কিন্তু অনুভব করতে পারছে না। তার ঠিক পিছনে একজন মা তার ছোট ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, ছেলেটা একটানা কথা বলে যাচ্ছে, মা ধৈর্য ধরে শুনছে মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছে। ছোট ছেলের অর্থহীন কথা ভেবে টুম্পা কান দিচ্ছিল না হঠাৎ করে সে তার কথা শুনে চমকে উঠল। ছেলেটি জিজ্ঞেস করছে, "আম্মু, কেন কাঁদছে মানুষটা?"

"তার কেউ একজন চলে যাচ্ছে মনে হয় সে জন্যে কাঁদছে।"

"তার কে যাচ্ছে?"

"ছেলে কিংবা মেয়ে। কিংবা ওয়াইফ।"

"কিন্তু আম্মু যারা ছোট তারা কাঁদে। বড় মানুষ কী কাঁদে?"

"খুব যখন দুঃখ হয় তখন বড় মানুষেরাও কাঁদে।

"মানুষটাকে পুলিশ কেন ধরে রাখছে আম্মু?"

"মানুষটা যে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে সে জন্যে।"

ছোট বাচ্চাটা মায়ের হাত ধরে বলল, "মানুষটা কেন ভেতরে ঢুকতে চাচ্ছে আম্মু?"

"মনে হয় যে চলে গেছে তাকে আরেকবার দেখতে চাচ্ছে।"

"তাহলে পুলিশ কেন তাকে আসতে দিচ্ছে না?"

"বাইরের কাউকে ভিতরে আসতে দেয়ার নিয়ম নাই তো, সে জন্যে।"

ছোট ছেলেটা সবকিছু বুঝে ফেলেছে এরকম ভঙ্গি করে গম্ভীর মুখে বলল, "ও!"

টুম্পা ফ্যাকাসে মুখে বাচ্চার হাত ধরে রাখা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "মানুষটা কী ফর্সা? নীল রঙের ফতুয়া পরে আছে? জিন্স?"

মহিলাটি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই টুম্পা ঘুরে পিছনে তাকালো তারপর একরকম ছুটে বের হয়ে গেল। গেটে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ তাকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, টুম্পা তাকে কোনো সুযোগ দিল না। ছুটতে ছুটতে সে বের হয়ে আসে—এক কোণায় মানুষের জটলা, দুজন পুলিশকে দেখা যাচ্ছে, টুম্পা ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে যায়। হ্যাঁ, তার আব্বু মেঝেতে বসে হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদছেন। কান্নার দমকে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

টুম্পা ছুটে গিয়ে আব্বুকে জড়িয়ে ধরে ডাকলো, "আব্বু।"

আব্বু সাথে সাথে মুখ তুলে তাকালেন। টুম্পার দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বললেন, "টুম্পা! তুই আমাকে ফেলে রেখে যাস নে মা!"

টুম্পা ফিস ফিস করে বলল, "যাব না আব্বু। আমি তোমাকে ফেলে যাব না।"

"সত্যি?"

"সত্যি আব্বু। সত্যি।"

আব্বু তখন টুম্পাকে জড়িয়ে ধরলেন। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটা সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারা এখানে ভীড় করেছেন কেন? যান। যান, নিজের কাজে যান।" ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো তখন সরে যেতে থাকে।

টুম্পা আব্বুর হাত ধরে যখন এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন কে একজন বলল, "আপনি বোর্ডিং কার্ড নিয়েছেন—আপনি তো এভবে চলে যেতে পারেন না—আপনার লাগেজ?"

টুম্পা তার কথা না শোনার ভান করে বাইরে বের হয়ে এল। এয়ারপোর্টের বড় বারান্দায় দাঁড়িয়ে টুম্পা দেখলো আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। মাঝে মাঝে বিজলি চমকাচ্ছে তার নীলাভ আলোতে সবকিছু কেমন যেন ঝলসে উঠচে।

আব্বু বললেন, "বৃষ্টি আসছে।"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ আব্বু।"

"অনেক বৃষ্টি।"

"হ্যাঁ আব্বু, অনেক বৃষ্টি। তুমি বৃষ্টিতে ভিজবে আব্বু?"

"তুই ভিজবি।"

"হ্যাঁ।"

"চল তাহলে।"

বড় বড় ফোটায় যখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে তখন সবাই অবাক হয়ে দেখলো ফুটফুটে একটা মেয়ে তার বাবার হাত ধরে রাস্তায় নেমে এসেছে। ঝমঝমে বৃষ্টিতে দুজনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার মাঝে দুজন একজনকে আরেকজনকে ধরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে।

পাশ দিয়ে একটা গাড়ি ছুটে যাবার সময় একটা ছোট ছেলে বলল, "বাবা দেখো দেখো ঐ মানুষটা আর মেয়েটা কী সুন্দর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে।"

বাবা মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন, বললেন, "হ্যাঁ বাবা।"

"কেন তারা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে?"

"মনে হয় তাদের মনে অনেক আনন্দ।"

"আমাদের মনে যদি অনেক আনন্দ হয় তাহলে কী আমরাও বৃষ্টিতে ভিজব?"

"হ্যাঁ বাবা তাহলে আমরাও বৃষ্টিতে ভিজব।"

ছোট ছেলেটি যতক্ষণ পারল ততক্ষণ টুম্পা আর তার আব্বুর দিকে তাকিয়ে রইল। আনন্দের কিছু দেখতে তার খুব ভালো লাগে।